BAGHBAZAR READING LIBRARY
CALCUTTA

(মহাত্মা গান্ধী লিখিত)

'সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা','বিপ্লবের আহুতি,'

'হিন্দু সংগঠন' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন

সঙ্কলিত

তরুণ সাহিত্য মন্দির,

১৮, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,

কলিকাতা

[মূল্য ।৴০ পাঁচ আনা মাত্র

নিবেদন

'হিন্দী-নবজীবন', 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' এবং 'Self-Restraint versus Self-Indulgence' নামক পুস্তকে মহাত্মা গান্ধী ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে যে সব প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার অনেকগুলির অনুবাদ "ব্রহ্মচর্য্য" নাম দিয়া প্রকাশ করিলাম।

কলিকাতা

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন

সূচী

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	সংযমের প্রয়োজনীয়তা	১
২।	গোপন কথা	১১
৩।	ব্রহ্মচর্য্য	১৭
৪।	আত্ম-সংযম	২৩
৫।	সত্য বনাম ব্রহ্মচর্য্য	২৮
৬।	পবিত্রতা	৩৩
৭।	জীবনী-শক্তি সঞ্চয়	৩৭
৮।	আত্ম কথা	৪২
৯।	জন্ম-নিরোধ	৫১
১০।	শেষ কথা	৫৪

হ্মচর্য্য

সংযমের প্রয়োজনীয়তা

স্বাস্থ্যরক্ষার নানা উপায় আছে। ইহার প্রত্যেকটি বিশেষ প্রয়োজনীয়; কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী দরকারী ব্রহ্মচর্য্য। বিশুদ্ধ বায়ু, নির্ম্মল জল এবং পুষ্টিকর খাদ্যই স্বাস্থ্যরক্ষার সাহায্য করে। কিন্তু যে শক্তি আমরা সঞ্চয় করি তাহা ব্যয় করিয়া ফেলিলে আমরা কিরূপে সুস্থ থাকিব? যে অর্থ আমরা উপার্জ্জন করি তাহা খরচ করিয়া ফেলিলে আমরা কিরূপে দরিদ্র না হইয়া পারি? খাঁটি ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিলে, নর-নারী কখনও বলবান হইতে পারে না।

ব্রহ্মচর্য্য কি? ইহার অর্থ এই, নর-নারী পরস্পর সম্বন্ধে কাম-চিন্তা হইতে বিরত থাকিবে। তাহারা কামচিন্তার সহিত পরস্পরকে স্পর্শ করিবে না, স্বপ্নেও এরূপ চিন্তাকে মনে স্থান দিবে না। তাহাদের পরস্পরের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রকার কাম-গন্ধ-হীন হইবে। যে গুপ্ত-শক্তি ভগবান আমাদিগকে দিয়াছেন তাহা কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার দ্বারা রক্ষা করিয়া কেবলমাত্র শারীরিক নহে, মানসিক ও আত্মিক উদ্যম ও শক্তি বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

কিন্তু চারিপাশে আমরা কি দৃশ্য দেখিয়া থাকি? নর-নারী যুবক-বৃদ্ধ ইন্দ্রিয়-সেবায় নিরত। কামান্ধ হইয়া, তাহারা ন্যায়-অন্যায় বিচার শক্তি হারায়। দেখিয়াছি ইহার মারাত্মক প্রভাবে পড়িয়া বালক-বালিকারা পর্য্যন্ত পাগলের ন্যায় ব্যবহার করে। ঠিক এইরূপ প্রভাবে পড়িয়া আমিও এরূপ করিয়াছি, ইহার অন্যথা হইবার উপায়ও ছিল না। যে জীবনী-শক্তি আমরা কঠিন পরিশ্রম সহকারে সঞ্চয় করি, ক্ষণিক সুখের জন্য তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে বিসর্জ্জন দিয়া থাকি। মোহ দূর হইলে, আমাদের অবস্থা শোচনীয় হয়। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা ভয়ানক দুর্ব্বলতা এবং ক্লান্তি অনুভব করি; এবং মন কোনো কাজ করিতে চায় না। ক্ষতিপূরণ করিবার আশায় আমরা প্রচুর পরিমাণ দুগ্ধ মোদক প্রভৃতি সেবন করি; স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য দূর করিবার জন্য সব রকম টনিক খাই এবং শরীরের ক্ষয়পূরণ করিবার ও ইন্দ্রিয়-শক্তিলাভের জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হই। এরূপে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়। ক্রমে আমরা বৃদ্ধ হই—তখন আমাদের শরীর ও মনের শক্তি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়।

কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম ঠিক ইহার বিপরীত। আমরা যত বৃদ্ধ হইব আমাদের বুদ্ধি তত তীক্ষ্ণ হইবে; যত দীর্ঘ দিন আমরা বাঁচিব আমাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফল অন্যলোকের উপকারে লাগানর শক্তি তত বাড়িবে। যাঁহারা খাঁটি ব্রহ্মচারী তাঁহাদের পক্ষে এ কথা নিশ্চয়ই খাটে। মৃত্যুভয় তাঁহাদের নাই; এবং মৃত্যুকালেও তাঁহারা ভগবানকে ভোলেন না। তাঁহারা মিথ্যা আশা লইয়া মত্ত থাকেন না। তাঁহারা হাসিতে হাসিতে মৃত্যুর সম্মুখীন হন, এবং শেষদিনের জন্য বীরের ন্যায় অপেক্ষা করেন। ইহারা খাঁটি মানুষ, শুধু ইহাদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে যে, ইহারা স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়াছেন।

আমরা কদাচিৎ ভাবিয়া দেখি যে, অসংযমই জগতের অধিকাংশ দম্ভ, রাগ, ভয় এবং হিংসার মূল। আমাদের মন যদি আমাদের বশে না থাকে, যদি প্রত্যেক দিন এক অথবা একাধিকবার আমরা ছোট শিশুর অপেক্ষা মূর্খের ন্যায় ব্যবহার করি, তবে জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে কোন্ পাপ আমরা না করিতে পারি? আমাদের কাজ যতই খারাপ ও পাপপূর্ণ হউক না কেন, তাহার ফল সম্বন্ধে কিরূপে আমরা চিন্তা না করিয়া পারি?

কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে, 'এরূপ খাঁটি ব্রহ্মচারী কে কবে কোথায় দেখেছে? যদি সব লোক ব্রহ্মচারী হয়, তবে কি মানব জাতি লোপ পেয়ে সমগ্র জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে না?' ধর্মের দিকটা বাদ দিয়া শুধু পার্থিব দিক দিয়া এই প্রশ্ন আলোচনা করিব। আমার মনে হয়, এরূপ প্রশ্ন শুধু আমাদের ভীরুতার পরিচয় দেয়। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে যে-ইচ্ছাশক্তির দরকার, তাহা আমাদের নাই, সেজন্য আমরা ওজর আপত্তি দেখাই। খাঁটি ব্রহ্মচারী সম্প্রদায় লুপ্ত হইয়া যায় নাই। কিন্তু যদি তাহাদিগকে যখন-তখন দেখা যাইত, তবে ব্রহ্মচর্য্যের মূল্য কি থাকিত? হাজার হাজার শ্রমিক পৃথিবীর অভ্যন্তরে গভীর গর্ত্ত করিয়া স্তূপ স্তূপ পাহাড় কাটিয়া একটু হীরক খুঁজিয়া বাহির করে। ইহা অপেক্ষা অনেক গুণ মূল্যবান ব্রহ্মচর্য্য পালন করার জন্য কত বেশী পরিশ্রম করা উচিত! ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে গেলে জগৎ লুপ্ত হইয়া যাইবে, এরূপ চিন্তা আমাদের না করাই ঠিক। আমরা কি ভগবান যে, আমরা জগতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এত চিন্তিত হইব? যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ইহা রক্ষা করিবেন। অন্য লোক ব্রহ্মচর্য্য পালন করে কি না, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। যখন আমরা কোনো কারবার অথবা কাজ করিতে শুরু করি,

তখন কি আমরা ভাবিয়া থাকি, যদি সকলেই ইহা করে, তবে পৃথিবীর অবস্থা কি হইবে? খাঁটি ব্রহ্মচারী শেষ পর্য্যন্ত এইরূপ প্রশ্নের উত্তর নিজেই পাইবেন।

কিন্তু যাহারা পার্থিব চিন্তায় বিব্রত, তাহারা এই আদর্শ কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিবে? বিবাহিতেরা কি করিবে? যাহাদের সন্তান-সন্ততি আছে তাহারা কি করিবে? যাহারা আপনাদিগকে সংযত রাখিতে পারে না তাহারা কি করিবে? পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি এক শ্রেষ্ঠ আদর্শে আমাদিগকে পৌঁছিতে হইবে। এই আদর্শ সর্ব্বদা চক্ষের সামনে রাখিয়া সেখানে পৌঁছানর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। শিশুদিগকে বর্ণমালা শিক্ষা দিবার সময় আমরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অক্ষরই দেখাই, এবং তাহারা যথাসাধ্য ঐ অক্ষর লিখিতে চেষ্টা করে। এইরূপে আদর্শ ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, দৃঢ়তার সহিত কাজ করিয়া গেলে আমরা পরিশেষে সফলকাম হইতে পারি। বিবাহিত জীবন হইলেই বা ক্ষতি কি? প্রকৃতির নিয়ম এই, যখন স্বামী-স্ত্রী সন্তানলাভের ইচ্ছা করিবে, তখন ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করা চলে। ইহা মনে রাখিয়া যাঁহারা চার-পাঁচ বৎসরের ভিতর একদিন ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম লঙ্ঘন করেন, তাঁহারা কামের দাস নহেন; তাঁহারা সঞ্চিত জীবনী-শক্তির বেশী-কিছু হারাইবেন না। কিন্তু হায়, শুধু সন্তানলাভের জন্য সহবাস করেন এরূপ স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা কত কম। অধিকাংশ লোকে কামপ্রপীড়িত হইয়াই ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করে—ফলে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাহাদের সন্তান জন্মে। ইন্দ্রিয়সুখে পাগল হইয়া আমাদের কাজের পরিণাম সম্বন্ধে আমরা কিছু ভাবি না। এ বিষয়ে নারী অপেক্ষা পুরুষজাতি অধিক দোষী। পুরুষ এত কামান্ধ যে, স্ত্রীর শরীর দুর্ব্বল কি না, সে গর্ভধারণ করিতে এবং সন্তান পালন করিতে সক্ষম

কি না, সে-চিন্তা সে কখনও করে না। পাশ্চাত্যদেশে লোকে সকল সীমা অতিক্রম করিয়াছে। তাহারা ইন্দ্রিয়সেবা করে, কিন্তু পিতামাতার দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে। এই বিষয়ে অনেক বই লেখা হইয়াছে এবং সন্তান নিরোধ করার জন্য নিয়মিতভাবে ব্যবসায় চলিতেছে। আমরা এখনও এই পাপ হইতে মুক্ত, কিন্তু নারীর উপর মাতৃত্বের বোঝা চাপাইতে সঙ্কোচবোধ করি না এবং একবার এ-চিন্তাও করি না যে, আমাদের শিশুগণ শক্তি-সামর্থ্যহীন। সন্তান জন্মিলে প্রত্যেকবার আমরা ভগবানকে ধন্যবাদ দি এবং এইরূপে আমাদের পাপ ঢাকিতে চেষ্টা করি। দুর্ব্বল, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, বিকলাঙ্গ এবং ভীরু সন্তান লাভ করিয়া নিজদিগকে ভগবানের ক্রোধের পাত্র মনে করা কি উচিত নয়? বালকবালিকার সন্তান হওয়া কি আনন্দের বিষয়? ইহা কি বরং একপ্রকার অভিশাপ নহে? কোনো চারা গাছের ফল হইলে, গাছ দুর্ব্বল হয়, এজন্য যাহাতে ফল বিলম্বে হয় তাহার জন্য সকল চেষ্টাই আমরা করি। কিন্তু বালক-বালিকা সন্তানের পিতামাতা হইলে, আমরা ভগবানের প্রশংসাগীতি গাহি। ইহা অপেক্ষা বেশী ভয়ানক কি কিছু হইতে পারে? আমরা কি মনে করি ভারতে এবং অন্যত্র এইরূপ অসংখ্য শিশু বাড়িতে থাকিলে জগতের মুক্তি আসিবে? এ-বিষয়ে আমরা ইতর প্রাণী অপেক্ষা অনেক হীন; কারণ তাহারা শুধু সন্তান উৎপত্তির জন্য সহবাস করে। গর্ভধারণের সময় হইতে শিশুর দুগ্ধত্যাগের সময় পর্য্যন্ত নরনারীর পৃথক থাকা অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু প্রাণঘাতী আমোদ-প্রমোদে মাতিয়া আমরা এই মহান্ কর্ত্তব্যের কথা ভুলিয়া যাই। এই দুরারোগ্য ব্যাধি আমাদের মনকে দুর্ব্বল করে এবং অল্পদিনের মধ্যে আমাদের দুঃখময় জীবনের অবসান করে। বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, বিবাহিত

লোকে তাহা যেন বুঝেন এবং সন্তানলাভের ইচ্ছা না হইলে যেন ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ না করেন।

কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় এ পথে চলা বড় শক্ত। আমাদের খাদ্য, জীবনযাপনপ্রণালী, কথাবার্ত্তা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমন যে, ইহার প্রত্যেকটি আমাদের ইন্দ্রিয়দিগকে উত্তেজিত করে। ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা বিষের ন্যায় আমাদের জীবনীশক্তি নষ্ট করিতেছে। এই দাসত্ব হইতে আমাদের মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে কেহ কেহ অবিশ্বাস করিতে পারেন। যাঁহারা এইরূপ সন্দেহ করেন তাঁহাদের জন্য এই বই লেখা হয় নাই; যাঁহারা ইহা লাভের জন্য আগ্রহান্বিত এবং আত্মোন্নতির জন্য সচেষ্ট, এ বই তাঁহাদের জন্য। যাঁহারা আপনাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট আছেন, তাঁহারা ইহা পড়াও কষ্টকর মনে করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা নিজেদের শোচনীয় অবস্থা বুঝিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের কাজে লাগিবে।

যে-কিছু বলা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, যাঁহারা এখনও অবিবাহিত আছেন, তাঁহারা যেন অবিবাহিত থাকিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু যদি তাঁহারা বিবাহ না করিয়া থাকিতে পারেন না, তবে যতদূর সম্ভব দেরী করিয়া যেন বিবাহ করেন। যুবকেরা যেন প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁহারা ২৫।৩০ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিবেন। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে শারীরিক উপকার ভিন্ন অন্যান্য যে-সব উপকার পাওয়া যায়, সে কথা এখানে আলোচনা করিব না।

যে-সব অভিভাবক এই অধ্যায় পড়িবেন, তাঁহাদের নিকট আমার অনুরোধ, অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া তাঁহারা যেন তাঁহাদের শিশু-পুত্রদের গলায় পাষাণ বাঁধিয়া না দেন। নিজেদের বৃথা অভিমান চরিতার্থের পরিবর্ত্তে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়দের

মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। তাঁহারা যেন বংশগৌরব অথবা সম্মান সম্বন্ধে সব-রকম ভ্রান্ত ধারণা হইতে মুক্ত হন এবং এরূপ হৃদয়হীন প্রথার স্রোতে গা ভাসাইয়া না দেন। যদি তাঁহারা সন্তানসন্ততির প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী হন, তবে তাঁহারা যেন তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখেন। যখন তাহারা শিশু-মাত্র, তখন তাহাদের বিবাহ দিয়া এবং বিবাহিত জীবনের গুরু দায়িত্ব ও ভাবনা-চিন্তা তাহাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া, অভিভাবকগণ আপন আপন সন্তান-সন্ততির ভীষণ অনিষ্ট করেন।

প্রকৃত স্বাস্থ্যনীতি অনুসারে বিপত্নীক এবং বিধবার পুনর্বিবাহ করা ঠিক নহে। যুবক-যুবতীর জীবনীশক্তি মাঝে মাঝে নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত কি না, এ সম্বন্ধে ডাক্তারদের ভিতর মতভেদ আছে; কেহ কেহ বলেন ইহা উচিত, কেহ কেহ বলেন অনুচিত। ডাক্তারদের ভিতর যখন এই মতভেদ আছে, তখন ডাক্তাররা সমর্থন করেন ভাবিয়া, আমরা যেন বেপরোয়াভাবে ইন্দ্রিয়সেবা না করি। নিজের এবং অন্যের অভিজ্ঞতা হইতে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য সহবাস কেবলমাত্র অনাবশ্যক নহে, বরং ইহা বিশেষ অনিষ্টকর। যে শারীরিক ও মানসিক শক্তি আমরা অনেকক্ষণ ধরিয়া সঞ্চয় করি, বীর্য্যের একবারমাত্র অপব্যবহারে তাহা মুহূর্ত্তেই নষ্ট হয়। এই প্রনষ্ট জীবনী-শক্তি উদ্ধার করিতে অনেক সময় আবশ্যক হয়, এবং একথা বলাও চলে না যে, ইহা সম্পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার করা যায়। ভাঙ্গা আয়না মেরামত করিয়া কাজ চালান যায়, কিন্তু ইহা ভাঙ্গা আয়না ভিন্ন আর কিছুই নহে।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, বিশুদ্ধ বায়ু, নির্ম্মল জল, স্বাস্থ্যকর খাদ্য এবং পবিত্র চিন্তা ভিন্ন জীবনী-শক্তি রক্ষা করা অসম্ভব। স্বাস্থ্য ও

নীতি-ধর্ম্মের সম্বন্ধ এরূপ ঘনিষ্ট যে, পবিত্র জীবনযাপন না করিলে, আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারি না। অতীতের-ভুল ত্রুটীর কথা ভুলিয়া, যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সহিত পবিত্র জীবন-যাপন করিতে, চেষ্টা করিবে, সে অচিরে ইহার ফল পাইবে। যাঁহারা অল্প সময়ের জন্যও ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তাঁহারাও দেখিবেন, তাঁহাদের শরীর ও মনের শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কোনোমতে তাঁহারা এই সম্পত্তি ত্যাগ করিতে রাজী হইবেন না। ব্রহ্মচর্য্যের মূল্য পূর্ণভাবে বুঝিয়াও, আমি ইহা ভঙ্গ করিয়াছি এবং এজন্য যথেষ্ট ভুগিয়াছি। এই পতনের আগের এবং পরের অবস্থার কথা তুলনা করিতে গেলে, আমি লজ্জা ও অনুতাপে মরিয়া যাই। কিন্তু অতীতের ভুল হইতে আমি এই সম্পত্তি অটুটভাবে রক্ষা করিতে শিখিয়াছি; এবং পূর্ণ বিশ্বাস করি, ভগবানের করুণায় ভবিষ্যতে আমি ইহা রক্ষা করিতে পারিব; কারণ আমি নিজে ব্রহ্মচর্য্যের অমূল্য ফলের স্বাদ পাইয়াছি। বাল্যকালে আমার বিবাহ হইয়াছিল এবং অল্প বয়সেই আমি সন্তানের পিতা হইয়াছিলাম। পরে আমার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া দেখিলাম, মানবজীবনের মূল নিয়ম-সম্বন্ধে আমি কত অজ্ঞ। যদি অন্ততঃ পক্ষে একজন পাঠকও আমার পতন এবং অভিজ্ঞতার কথা জানিয়া হুঁশিয়ার ও লাভবান হয়, তবে এই অধ্যায় লেখা সার্থক হইয়াছে মনে করিব। অনেকে আমাকে বলিয়াছেন, এবং আমিও ইহা বিশ্বাস করি যে, আমার যথেষ্ট উৎসাহ ও শক্তি আছে এবং আমার মন কোনোরূপে দুর্ব্বল নহে। কেহ কেহ বলেন, আমার শক্তি এত বেশী যে, আমাকে একগুঁয়ে বলাও চলে তথাপি অতীতের কার্য্যের ফলস্বরূপ আমার মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা আছে। অবশ্য বন্ধুদের তুলনায় আমি নিজেকে সুস্থ ও বল-

বান বলিতে পারি। বিশ বৎসর ইন্দ্রিয়সেবার পরও, আমি যখন এ অবস্থায় পৌঁছিতে পারিয়াছি, তখন ঐ বিশ বৎসরও যদি পবিত্র থাকিতে পারিতাম, তবে আমার অবস্থা আরও কত ভাল হইত! আমার এ বিশ্বাস পুরোপুরি আছে, যদি সারাজীবন অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারিতাম, তবে আমার উৎসাহ ও শক্তি হাজার গুণ বেশী হইত এবং আমি সেই শক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজের ও দেশের কাজ করিতাম। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে গিয়া, আমার ন্যায় অসম্পূর্ণ ব্রহ্মচারী যদি এত উপকার পাইয়া থাকে, তবে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালনের ফলে যে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক-শক্তি লাভ হইবে, তাহা কত বিস্ময়জনক!

ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম যখন এত কঠিন, তখন যাহারা অবৈধভাবে ইন্দ্রিয়সেবা করে, তাহাদিগকে কি বলিব? ব্যভিচার এবং বেশ্যাবৃত্তি হইতে উদ্ভূত পাপ, ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের একটি কঠিন সমস্যা। স্বাস্থ্য-নীতি-গ্রন্থে ইহা পূর্ণভাবে আলোচিত হইতে পারে না। এখানে এইটুকু দেখাইব, যাহারা এ-সব পাপে লিপ্ত, তাহাদের ভিতর সহস্র সহস্র লোকে কুৎসিৎ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এই হিসাবে ভগবান দয়ালু যে, তিনি পাপীকে শীঘ্রই শাস্তি দেন। এইসব লোকের জীবন হাতুড়ে চিকিৎসকের শোচনীয় দাসত্বের ভিতর থাকিয়া শীঘ্রই শেষ হয়—তাহারা বৃথা তাহাদের ব্যাধির ঔষধ খুঁজিয়া বেড়ায়। ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ হইলে বর্ত্তমানে যত ডাক্তার আছে, অন্ততঃ পক্ষে তার অর্দ্ধেকের কাজ থাকিবে না। এইসব কুৎসিৎ ব্যাধি মানুষকে এমনভাবে পাইয়া বসিয়াছে যে, চিন্তাশীল চিকিৎসকগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, যতদিন ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তি থাকিবে, ব্যাধিনিরাময়ের ঔষধ আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বে, ততদিন মানব-

জাতির কোনো আশা নাই। এইসব ব্যাধির ঔষধ এত বিষাক্ত যে, সাময়িক উপকার করিলেও তাহারা মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে, এবং এইসব রোগ বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হইয়া থাকে।

কিরূপে বিবাহিত লোকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শুধু বাতাস, জল ও খাদ্য-সম্বন্ধে নিয়ম পালন করিলেই হইবে না। স্ত্রীর সহিত স্বামী গোপনে সাক্ষাৎ করিবে না। সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, স্বামী-স্ত্রীর গোপনে থাকার উদ্দেশ্যই ইন্দ্রিয়সেবা। রাত্রে তাহারা পৃথক পৃথক কুঠরীতে থাকিবে এবং দিনের বেলায় সর্ব্বদা ভাল কাজে ব্যাপৃত থাকিবে। তাহারা এমন সব বই পড়িবে, যাহাতে তাহাদের মন উচ্চ চিন্তায় পূর্ণ হয়। তাহারা বড় বড় লোকের জীবনী আলোচনা করিবে এবং একথা সব সময় মনে রাখিবে যে, ইন্দ্রিয়সেবা বহুদুঃখের মূল কারণ। কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার ইচ্ছা হইলেই শীতল জলে স্নান করিবে, ইহাতে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা কমিয়া যাইবে এবং সৎকাজ করার শক্তি বাড়িবে। এ কাজ করা শক্ত; কিন্তু অসুবিধার সহিত লড়াই করিয়া জয়লাভ করার জন্যই আমাদের জন্ম হইয়াছে। এইরূপ করিবার সঙ্কল্প যাহার নাই, সে কখনও প্রকৃত স্বাস্থ্যসুখ লাভ করিতে পারে না।*

(গান্ধীজীর লেখা গুজরাটী আরোগ্য-নীতি বইএর ইংরেজী অনুবাদ হইতে।)

গোপন কথা

কৌমার্য্য-ব্রতকে ব্রহ্মচর্য্য বলা চলে—অবশ্য ব্রহ্মচর্য্য কৌমার্য্য অপেক্ষা ব্যাপক। সমস্ত ইন্দ্রিয় ও শরীর আয়ত্তে রাখাই ব্রহ্মচর্য্য। পূর্ণ-ব্রহ্মচারীর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। কিন্তু ইহা হইল আদর্শ অবস্থা—লোকে কদাচিৎ এ অবস্থায় পৌঁছিয়া থাকে। ইউক্লিডের রেখা কল্পনা করা চলে, কিন্তু আঁকা যায় না; তথাপি ইহা জ্যামিতির এক প্রধান সংজ্ঞা এবং ইহার সাহায্যে অনেক প্রয়োজনীয় কাজ সিদ্ধ হয়। পূর্ণব্রহ্মচারীর আদর্শ এইরূপ কল্পনার বস্তু। কিন্তু আমরা যদি ইহাকে সব সময় মনশ্চক্ষুর সাম্নে না রাখি, তবে আমাদের দশা হাল-শূন্য জাহাজের ন্যায় হইবে। কল্পিত আদর্শের যত বেশী কাছে আমরা পৌঁছিব, ততই আমাদের পূর্ণতা আসিবে।

এখন কৌমার্য্য-অর্থে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। আমি বিশ্বাস করি, পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা লাভ করিতে হইলে, চিন্তা বাক্য ও কার্য্যে পূর্ণ সংযম চাই। যে জাতির ভিতর এরূপ লোক নাই, তাহার অবস্থা শোচনীয়। জাতীয় অভিব্যক্তির বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার সাময়িক প্রয়োজনীয়তা প্রচার করাই আমার উদ্দেশ্য।

আমাদের ভিতর বেশীমাত্রায় দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধি আছে। লক্ষ লক্ষ লোক না খাইয়া মরিতেছে। দাসত্বের চক্রে পিষ্ট হইয়া আমাদের অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়াছে যে, আমাদের অনেকে

ইহাকে দাসত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে চান না ; এবং দেশের উপর আর্থিক, মানসিক ও নৈতিক শোষণরূপ তিন রকম অভিসম্পাৎ থাকা সত্ত্বে, তাঁহারা বলেন, দেশ ক্রমশঃ উন্নতি ও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতেছে। চিরবর্দ্ধমান সামরিক ব্যয়, ল্যাঙ্কাশায়ার ও অন্যান্য ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপোষক অনিষ্টকর রাজস্বপ্রথা এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ এমন অমিতব্যয়িতার সহিত নিয়ন্ত্রিত হয় যে, ভারতের উপর অতিরিক্ত কর বসাইয়া ভারতের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং ভারতবাসীর রোগ-প্রতিরোধ করার শক্তি কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গোখেলের কথায় বলিব, শাসনপ্রথা জাতীয় উন্নতিকে এত খর্ব্ব করিয়াছে যে, আমাদের মধ্যে যাঁহারা খুব শক্তিশালী, তাঁহাদিগকেও মাথা নীচু করিতে হইয়াছে। ভারতকে অমৃতসরে বুকে ভর দিয়া চলিতে হইয়াছিল। ইচ্ছা করিয়াই পাঞ্জাবের অপমান করা এবং ভারতীয় মোছলমানদের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়। এজন্য ক্ষমা-প্রার্থনা এবং ক্রটীস্বীকার পর্য্যন্ত করিতে না চাওয়া, নৈতিক শোষণের হাল-নমুনা। এগুলি আমাদের আত্মাকে ব্যথিত করে। যদি আমরা এই অন্যায় মানিয়া লই, তবে আমাদের মনুষ্যত্ব ষোল আনা নষ্ট হইবে।

এরূপ মনুষ্যত্ব-নষ্টকারী আবহাওয়ার মধ্যে কি জানিয়া শুনিয়া আমাদের সন্তান উৎপাদন করা ঠিক? যতদিন আমরা নিজদিগকে অসহায় মনে করিব এবং অসহায় থাকিব, যতদিন ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইব, ততদিন সন্তান উৎপাদন করিলে শুধু গোলাম ও দুর্ব্বল লোকের সংখ্যা বাড়ান হইবে। যতদিন ভারত স্বাধীন না হইবে, যতদিন ভারতবাসী নিবার্য্য অনাহারজনিত মৃত্যুকে ঠেকাইতে না পারিবে এবং দুর্ভিক্ষকালে ও অন্যসময়ে অন্নাভাব হইতে মুক্ত না

হইবে, যতদিন ভারতবাসী ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা এবং অন্যান্য মহামারী নিবারণের জ্ঞানলাভ না করিবে, ততদিন আমাদের সন্তানজন্ম দেওয়ার অধিকার নাই। এই অভিশপ্ত দেশে সন্তান-জন্মের খবর পাইলে আমি ব্যথিত হই। বৎসরের পর বৎসর স্বেচ্ছায় সন্তান-জন্ম না দেওয়ার কথা ভাবিয়া, আমি সন্তোষলাভ করিয়াছি। ভারত তার বর্ত্তমান লোকসংখ্যার তত্ত্বাবধান করার উপযুক্ত নহে। ইহার কারণ ইহা নহে যে, ভারতে বহু লোক বাস করে; ইহার কারণ এই, বল প্রয়োগে বিদেশী তার উপর কর্ত্তৃত্ব করে এবং বিদেশীর মূলমন্ত্র ক্রমশঃ ভারতের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করা।

কিরূপে এই সন্তান-উৎপাদন বন্ধ রাখিতে হইবে? ইউরোপে যেরূপ নীতিবিগর্হিত কৃত্রিম উপায়ে ইহা করা হয়, তাহা করিলে চলিবে না, কিন্তু নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সংযমের সাহায্যে ইহা করিতে হইবে। মা-বাপ সন্তানকে যেন ব্রহ্মচর্য্য পালন করা শিক্ষা দেন। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে ২৫ বৎসরের কম বয়সে বালকদের বিবাহ দেওয়া নিষিদ্ধ। ভারতের মা-দিগকে যদি বুঝান যাইত যে, বালক বালিকাদিগকে বিবাহিত জীবনযাপনের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া পাপ, তবে ভারতের অর্দ্ধেক বিবাহ আপনা হইতে বন্ধ হইত। এ দেশ উষ্ণপ্রধান বলিয়া, বালিকাদের গর্ভধারণ শক্তি অল্পবয়সে উৎপন্ন হয়, এই ভূয়া কথায় যেন আমরা বিশ্বাস না করি। ইহার চেয়ে সাংঘাতিক কুসংস্কারের কথা আমি জানি না। আমি বিশেষ জোরের সহিত বলিতেছি, গর্ভধারণের বয়সের সহিত আবহাওয়ার কোনো সম্বন্ধ নাই। আমাদের পারিবারিক জীবনের মানসিক ও নৈতিক বেষ্টনীই অসময়ে গর্ভধারণের মূল কারণ।

নির্দ্দিষ্ট বয়সে যে তাহাদের বিবাহ হইবে, একথা মা এবং অপর আত্মীয়েরা ধর্ম্মকাজের ন্যায় শিশুদিগকে শিক্ষা দেন। শিশুকালে, এমন কি কোলে থাকিতেও, তাহাদের বিবাহের কথা ঠিক হয়। শিশুদের পোষাক ও খাদ্য ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক। শিশুদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, আমাদের নিজেদের খেয়াল তৃপ্তির জন্য আমরা তাহাদিগকে পুতুলের মত সাজাই। আমি অনেক শিশুকে লালন পালন করিয়াছি। যে রকম পোষাক তাহাদিগকে দিয়াছি, তাহাই তাহারা সানন্দে গ্রহণ করিয়াছে। আমরা তাহাদিগকে সবরকম গরম উত্তেজক খাদ্য খাইতে দেই। মোহবশে তাহাদের শক্তির কথা ভাবি না। ফলে অসময়ে যৌবন প্রাপ্তি, অপ্রাপ্ত বয়সে সন্তান-সন্ততির জন্ম এবং অকাল-মৃত্যু হয়। পিতামাতার দৃষ্টান্ত বালকেরা সহজে গ্রহণ করে। নিজেরা বেপরোয়াভাবে ইন্দ্রিয়ের সেবা করিয়া, তাঁহারা শিশুদের নিকট অসংযত জীবনের আদর্শ হইয়া উঠেন। অসময়ে যখনই কোনো নূতন জীব পরিবারে দেখা দেয়, তখনই আমোদ-প্রমোদ ও নিমন্ত্রণের ঘটা পড়িয়া যায়। যেরূপ আবহাওয়ার ভিতর আমরা থাকি, তাহাতে যে আমরা আরও অসংযত হই নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। আমার ইহাতে একটুও সন্দেহ নাই যে, বিবাহিত লোকে যদি দেশের মঙ্গল চান এবং ভারতভূমিকে সুন্দর শক্তিশালী পূর্ণাবয়ব পুরুষ ও স্ত্রী দ্বারা অধ্যুষিত দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহারা যেন সাময়িকভাবে পূর্ণ সংযম অভ্যাস করেন ও সন্তান উৎপত্তি বন্ধ রাখেন। নূতন বিবাহিতদিগকেও আমি এই পরামর্শ দেই। মাতাল অথবা পরিমিত মদ্যপানকারী অপেক্ষা যিনি কোনো দিন মদ খান নাই, তার পক্ষে মদ না খাইয়া থাকা যেমন বেশী সহজ, তেম্‌নি কোনো কাজ আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া

অপেক্ষা, তাহা মোটেই আরম্ভ না করা উচিত। মাটিতে পড়িয়া উঠার অপেক্ষা প্রথম হইতে খাড়া থাকা সহজ। যাঁহারা বলেন, যাহাদের ভোগবাসনা তৃপ্ত হইয়াছে, কেবল তাহাদের নিকট সংযমের কথা বলা উচিত, তাহারা ভুল করেন। দুর্ব্বল দেহধারীর নিকট সংযমের কথা বলায় কোনো লাভ নাই। আমার কথা এই, আমরা যুবকই হই অথবা বৃদ্ধ হই, তৃপ্ত অথবা অতৃপ্ত হই, বর্ত্তমান সময়ে গোলামের সংখ্যাবৃদ্ধি না করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

স্বামী-স্ত্রীকে বলিব, তাঁহারা যেন পরস্পরের অধিকারের কথা না ভাবেন। অসংযমের পথে চলার জন্য সম্মতির দরকার, সংযমের পথে চলার জন্য ইহার দরকার নাই, ইহা স্পষ্ট সত্য।

জীবন-মরণ সমস্যা লইয়া আমরা যখন শক্তিশালী গভর্ণমেণ্টের সহিত বিরোধ করিতেছি, তখন ইহার জন্য আমাদের সমস্ত শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। যে জিনিষ সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান, তাহা আয়ত্ত করিতে না পারিলে, আমরা এই যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিব না। এই ব্যক্তিগত পবিত্রতা না আসিলে, আমরা গোলামের জাতি থাকিয়া যাইব। শাসন-প্রথাকে দূষিত মনে করি বলিয়া, ইংরেজদিগকে যেন আমরা হীন মনে না করি। ইহাতে আত্মবঞ্চনা করা হইবে। কোনো আড়ম্বর না করিয়া তাহারা নিজ নিজ জীবনকে ধর্ম্মপথে চালায়। আমাদের দেশে যত কৌমার্য্যব্রতধারী স্ত্রী পুরুষ আছে, তাহাদের দেশে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আছে। আমাদের দেশে কুমারী নাই বলিলেই চলে। অবশ্য যাহারা রাজনীতির কোনো ধার ধারেন না, এরূপ কতকগুলি মঠবাসিনী নারী আছেন। কিন্তু ইউরোপে হাজার হাজার কৌমার্য্যব্রতধারী নারী আছেন।

ব্রহ্মচর্য্য

আমি পাঠকদের সামনে এখন কয়েকটি সরল নিয়ম পেশ করিব। এগুলি শুধু আমার ও আমার সঙ্গীদের অনেকের অভিজ্ঞতালব্ধ।

(১) বালক বালিকাদিগকে এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন পুরোপুরি বিশ্বাস করিতে পারে, তাহারা নিষ্পাপ এবং নিষ্পাপ থাকিতে পারে।

(২) সকলে গরম উত্তেজক দ্রব্য, লঙ্কার ন্যায় মশলা, চর্ব্বিযুক্ত জমাট খাদ্য, মিষ্টদ্রব্য এবং ভাজা জিনিষ বর্জ্জন করিবে।

(৩) স্বামী স্ত্রী পৃথক ঘরে থাকিবে এবং কখনও নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিবে না।

(৪) শরীর ও মনকে সব সময় সৎকাজে নিয়োজিত রাখিবে।

(৫) সকালে শোয়া এবং সকালে বিছানা হইতে উঠা কঠোরভাবে পালন করিতে হইবে।

(৬) সব রকম কদর্য্য সাহিত্য বর্জ্জন করিতে হইবে। সৎচিন্তাই কুচিন্তা দূর করিবার উপায়।

(৭) ইন্দ্রিয়-উত্তেজক থিয়েটার বায়স্কোপ প্রভৃতি বর্জ্জন করিতে হইবে।

(৮) স্বপ্নদোষ হইলে কোনো ভাবনা করিতে হইবে না। এই অবস্থায় সাধারণ শক্তিশালী ব্যক্তির পক্ষে প্রাতঃস্নানই বিশেষ উপকারী।

(৯) মধ্যে মধ্যে হাল ছাড়িয়া দিয়া চলিলেই অনিচ্ছায় স্বপ্নক্ষরণ বন্ধ হইবে, এই ধারণা ভুল।

(১০) এই সংযম এত কঠিন নহে যে, স্বামীস্ত্রীর পক্ষেও ইহা পালন করা অসম্ভব। পক্ষান্তরে সংযমকে সাধারণ ও স্বাভাবিক মনে করা উচিত।

(১১) প্রত্যহ মনেপ্রাণে প্রার্থনা করিলে লোকে ক্রমশঃ পবিত্র হইতে পারে।

ইয়ং-ইণ্ডিয়া—১৩ই অক্টোবর, ১৯২০, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

ব্রহ্মচর্য্য

এই বিষয়ে কিছু লেখা সহজ নহে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতার কথা পাঠকদিগকে জানাইব ভাবিয়াছি। আমার নিকট কতকগুলি চিঠি আসিয়া এই ইচ্ছা বাড়াইয়াছে।

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়াছেন—"ব্রহ্মচর্য্য কি? ইহা ষোল আনা পালন করা সম্ভব কি না? সম্ভব হইলে, আপনি ইহা পালন করেন কি না?"

ব্রহ্মচর্য্যের পূর্ণ ও প্রকৃত অর্থ ব্রহ্ম-অন্বেষণ। ব্রহ্ম সকলের মধ্যে আছেন। ধ্যান এবং ধ্যানলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে ব্রহ্মকে খুঁজিতে হইবে। পূর্ণ ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত এ জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব। অতএব সব সময় সব অবস্থায় কায়মনোবাক্যে সংযম পালন করাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে।

যে পুরুষ বা স্ত্রী এইরূপে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তিনি সম্পূর্ণ-রূপে নির্বিকার। এইরূপ নির্বিকার ব্যক্তি ভগবানের নিকটে বাস করেন; তিনি ভগবান-সদৃশ।

ইহাতে আমার একটুও সন্দেহ নাই যে, কায়মনোবাক্যে এইরূপ ব্রহ্মচর্য্য ষোল আনা পালন করা যাইতে পারে। দুঃখের সহিত জানাইতেছি, আমি এখনও পূর্ণব্রহ্মচারী হইতে পারি নাই। সেই অবস্থায় পৌঁছিতে অবিরত চেষ্টা করিতেছি; এবং এই শরীরেই সেখানে পৌঁছিবার আশা ত্যাগ করি নাই। আমি শরীরকে বশে

আনিয়াছি। জাগ্রত অবস্থায় আমি সংযম রক্ষা করিতে পারি। বাক-সংযম আমার একরূপ অভ্যাস্ হইয়াছে। চিন্তায় সংযম আমার এখনও আসে নাই। এক চিন্তা করার সময় অন্য চিন্তাও আসিয়া পড়ে। এজন্য চিন্তারাজ্যে অনবরত লড়াই চলে।

অবশ্য জাগ্রত অবস্থায় চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি ; এ সময় মনে কোনো কুচিন্তা আসে না। কিন্তু ঘুমের সময় চিন্তাকে এত সংযত রাখিতে পারি না। নিদ্রাকালে অনেক রকম চিন্তা আসে। যাহা কোনো দিন ভাবি নাই, সেরূপ স্বপ্ন পর্য্যন্ত দেখি। এই শরীর দ্বারা যাহা ভোগ করিয়াছি, সেই সব বাসনার কথাও মনে পড়ে। এইসব বাসনা অপবিত্র হইলে কু-স্বপ্ন দেখি। যার ইন্দ্রিয়বিকার হয়, তার এ অবস্থা হইতে পারে।

আমার এইরূপ চিন্তা-বিকার কমিয়া আসিতেছে ; কিন্তু একেবারে নষ্ট হয় নাই। যদি আমি চিন্তায় সংযমী হইতাম, তবে গত ১০ বৎসরের মধ্যে জ্বর, আমাশয় ও আপেণ্ডিসাইটিস ব্যারামে ভুগিতাম না। আমি মানি, নিষ্পাপ আত্মা নীরোগ শরীরে বাস করে—অর্থাৎ আত্মা যত নিষ্পাপ ও নির্বিকার হয়, শরীরও তত নিরোগ হয়। নিরোগ শরীরের অর্থ বলবান শরীর নয়। শক্তিশালী আত্মা ক্ষীণ শরীরেই বাস করে। আত্মার শক্তি যেমন বাড়িতে থাকে, নির্দ্দিষ্ট সীমার পর শরীরের ক্ষীণতাও তেম্নি বাড়ে। সম্পূর্ণ নিরোগ দেহ বহুত ক্ষীণ হইতে পারে। বলবান শরীরে অনেক রোগ থাকিতে পারে। রোগ না হইলেও ছোঁয়াচে অথবা সংক্রামক ব্যাধি এইরূপ শরীরকে সহজে আক্রমণ করে। কিন্তু সম্পূর্ণ নীরোগ শরীরে এ সব আক্রমণ হইতে পারে না। বিশুদ্ধ রক্ত এই সব সংক্রামক ব্যাধিকে প্রতিরোধ করে।

এরূপ অবস্থায় পৌছান অবশ্য শক্ত, নহিলে আমি এতদিন সেখানে পৌছিতাম; কারণ আমার অন্তরাত্মা সাক্ষ্য দিবে যে, যে উপায়ে এই অবস্থায় পৌছান যায়, আমি তাহা অবলম্বন করিতে ত্রুটী করি নাই। এমন কোনো বাহিরের বাধা নাই, যাহা আমাকে ঐ আদর্শ হইতে দূরে রাখিতে সমর্থ; কিন্তু পুরাতন সংস্কার মন হইতে মুছিয়া ফেলা সকলের পক্ষে সহজ নহে। এজন্য দেরী হইতেছে। কিন্তু ইহাতে আমি মোটেই নিরাশ হই নাই, কারণ পূর্ণ নির্বিকার অবস্থার চিত্র আমি কল্পনার চোখে দেখিতেছি। আমি তাহার অস্পষ্ট আলোকরশ্মি দেখিয়াছি এবং এ পর্য্যন্ত যতটুকু অগ্রসর হইয়াছি,তাহাতে নিরাশ না হইয়া আশান্বিত হইয়াছি। আশাপূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে যদি আমার এ দেহ নষ্ট হয়, তবে আমার চেষ্টা বিফল হইয়াছে মনে করিব না। এই শরীরকে যতখানি বিশ্বাস করি, পুনর্জন্মে আমি ততখানি বিশ্বাস করি। আমি জানি স্বল্প প্রযত্নও ব্যর্থ হয় না।

যাঁহারা আমার নিকট চিঠি দিয়াছেন এবং যাঁহারা এই প্রকৃতির লোক, তাহাদের ধৈর্য্য ও আত্ম-বিশ্বাস বাড়িবে বিশ্বাসে, আমি নিজের কথা এত করিয়া বলিলাম। সকলের আত্মা এক। সকলের আত্মার শক্তি একরূপ হইতে পারে। কাহারও শক্তির বিকাশ হইয়াছে এবং কাহারও হয় নাই। চেষ্টা করিলে প্রত্যেকে এই শক্তির বিকাশ করিতে পারেন।

এ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাপক অর্থ আলোচনা করিয়াছি। ব্রহ্মচর্য্যের লৌকিক বা প্রচলিত অর্থ কায়মনোবাক্যে কামদমন। এই সীমাবদ্ধ অর্থ বেশ। কারণ এই ব্রহ্মচর্য্য পালন করাও অনেক শক্ত। সমস্ত ইন্দ্রিয় বিশেষতঃ রসনেন্দ্রিয় সংযমের কথা লোকে বিশেষরূপে ভাবে নাই। রসনা বা আহার সংযমের দিকে লোকের লক্ষ্য যায় নাই

বলিয়া, কামদমন এত মুস্কিল ও প্রায় অসম্ভব হইয়াছে। তার উপর, চিকিৎসকগণ বলেন, রুগ্ন শরীরে বিষয়বাসনা অধিক থাকে এবং দুর্ব্বল জাতির পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা স্বভাবত কঠিন।

আমি উপরে ক্ষীণ অথচ নীরোগ শরীর সম্বন্ধে লিখিয়াছি। কেউ না ভাবেন আমি শারীরিক বলচর্চ্চা করিতে নিষেধ করিয়াছি। আমি সূক্ষ্ম ব্রহ্মচর্য্যের কথা অতি সরল ভাষায় লিখিয়াছি। ইহা লোকে ভুল বুঝিতে পারে। যিনি পূর্ণ সংযম চান, শরীর ক্ষীণ হইলে, তাহাকে আনন্দিত হইতে হইবে। যখন শরীরের প্রতি মোহ ও আসক্তি নষ্ট হইবে, তখন শারীরিক বলের অধিকারী হওয়ার ইচ্ছাও থাকিবে না। অবশ্য খাঁটি ব্রহ্মচারীর শরীর অতি তেজ-পূর্ণ ও বলশালী না হইয়া পারে না। এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যও অলৌকিক। স্বপ্নাবস্থায়ও যাঁহার ইন্দ্রিয়বিকার হয় না, তিনি জগদ্বরেণ্য। এরূপ ব্যক্তি সহজে অপর ইন্দ্রিয় সংযম করিতে পারেন।

এই ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—'আমার অবস্থা শোচনীয়। আফিস আদালতে থাকার সময়, রাস্তা-ঘাটে চলার সময়, পড়ার সময়, কাজ করার সময়, উপাসনার সময়, দিনরাত্রি সব সময় কামচিন্তা করি। কিরূপে মনকে সংযত করিব? কিরূপে নারীজাতির প্রতি মাতৃভাব পোষণ করিতে শিখিব? কিরূপে দৃষ্টি পবিত্রপ্রেমপূর্ণ হইবে? কুচিন্তা কিরূপে নির্ম্মূল হইবে? ব্রহ্মচর্য্য-বিষয়ক আপনার পুরাতন লেখা আমার নিকট আছে, কিন্তু তাহা হইতে কোনো সাহায্য পাইতেছি না।'

এ অবস্থা হৃদয়বিদারক। অনেকে এরূপে কষ্ট পান। পরন্তু যতক্ষণ মন কুচিন্তার সহিত যুদ্ধ করিতে থাকে, ততক্ষণ নিরাশ হইবার কারণ নাই। খারাপ দৃশ্য দেখিলে চোখ বুজিতে হইবে, খারাপ কথা

শুনিলে তুলা দিয়া কান বন্ধ করিতে হইবে। মাটির দিকে চাহিয়া পথচলার রীতি ভাল; ইহাতে চোখ বিপথে চলার অবসর পাইবে না। যেখানে কু-কথা অথবা কু-সঙ্গীত হয়, সেখান হইতে সরিয়া যাইবে। সকল প্রকার ইন্দ্রিয় সংযমের চেষ্টা একসাথে করা চাই।

নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি, যিনি রসনা সংযত করেন নাই, তিনি কামদমন করিতে পারিবেন না। রসনা সংযত করা খুব কঠিন। কিন্তু রসনা সংযমের সঙ্গে সঙ্গে কামদমনের সম্ভাবনা আছে। পুরোপুরি অথবা যথাসাধ্য মশলা ত্যাগ করা লোভদমনের এক উপায়। দ্বিতীয় উপায়, যাহা কিছু আমরা খাই তাহা জিহ্বার তৃপ্তির জন্য খাই না, শরীররক্ষার জন্য খাই—এই ভাবকে বৃদ্ধি করা। অবশ্য ইহাও শক্ত। শ্বাসগ্রহণের জন্য আমরা হাওয়া খাই, স্বাদের জন্য নহে। পিপাসা নিবারণের জন্য জল পান করি। এইরূপে কেবল ক্ষুধাশান্তির জন্য আমাদেব খাওয়ার দরকার। শিশুকাল হইতেই মা বাপ আমাদিগকে উল্টা শিক্ষা দেন। আমাদের শরীর পুষ্টির দিকে নজর না দিয়া, জিহ্বার তৃপ্তিকর নানাপ্রকার জিনিষ খাওয়াইয়া তাঁহারা আমাদিগকে আলালেব ঘরের দুলাল করিয়া তোলেন। এরূপ অবস্থার সহিত আমাদিগকে লড়িতে হইবে।

কামদমনের স্বর্ণ-উপায়, 'রামনাম' অথবা এইরূপ মন্ত্র পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করা। দ্বাদশ মন্ত্রেও † হইবে। প্রত্যেকেই নিজের মন অনুসারে মন্ত্র নির্ব্বাচন করিয়া উহা জপ করিবেন। আমি বাল্যকাল হইতে রামনাম লইতে শিক্ষা পাইয়াছি; এই নাম করিয়া আমি সব সময় বল পাইয়াছি। এজন্য আমি রামনামের উল্লেখ করিয়াছি। যিনি যে মন্ত্রই গ্রহণ করুন না কেন, জপিবার সময় তাহাতে তন্ময়

† ওঁ নমো ভগবতে ...

8 - 22852
Acc 22852
২০।১২।৭২

হওয়া চাই। প্রথম প্রথম জপকালে অন্যকথা মনে আসিলেও চিন্তা নাই। শ্রদ্ধার সহিত নাম জপিতে থাকিলে, পরে সফলতা নিশ্চয়ই আসিবে, ইহাতে আমার একরত্তিও সন্দেহ নাই। এই মন্ত্রকে জীবনের প্রধান অবলম্বনরূপে ধরিতে পারিলে, ইহাই সকল সঙ্কট হইতে রক্ষা করিতে পারে। আর্থিক লাভের জন্য কেহ যেন এই মন্ত্র খাটাইতে না যান। নৈতিক চরিত্র রক্ষার জন্য প্রযুক্ত হইলে, ইহার ফল বিস্ময়কর হইবে। অবশ্য একথা মনে রাখা চাই যে, শুধু তোতার ন্যায় আওড়াইলে মন্ত্রে কোন ফল দিবে না—ইহার ভিতর মনোপ্রাণ ঢালিয়া দিতে হইবে। তোতাপাখী মন্ত্রের ন্যায় ইহা পড়িয়া থাকে। এই মন্ত্র জপিলে কুচিন্তা নিকটে আসিতে পারিবে না, এই বিশ্বাস প্রবল রাখিয়া ইহা জপিতে হইবে।

হিন্দী-নবজীবন—২৫শে মে, ১৯২৪—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

আত্ম-সংযম

ভাদ্‌রণ নামক স্থানে এক মানপত্রের উত্তর দিবার সময় গান্ধীজী ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, তার সার মর্ম্ম এখানে দেওয়া গেল :—

ব্রহ্মচর্য্য এমন জিনিষ যাহা বলিয়া বুঝান যায় না। আপনারা তো মামুলি ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে শুনিতে চান। সমস্ত ইন্দ্রিয়সংযম রূপ ব্যাপক ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে জানিতে চান না। এই সাধারণ ব্রহ্মচর্য্যকেও শাস্ত্রকারগণ খুব কঠিন বলিয়াছেন; এ কথা সত্য। আমরা অন্যান্য ইন্দ্রিয় সংযত রাখি না বলিয়া, ইহা পালন করা কঠিন ঠেকে। ইহার মধ্যে প্রধান হইল রসনেন্দ্রিয়। যে ব্যক্তি লোভ দমন করিতে পারে, তার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যপালন সহজ। প্রাণীবিদগণ বলেন, পশুরা যতটা ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, মানুষ ততটা করে না। ইহা সত্য। ইহার কারণ পশুগণ আপনাদের রসনাকে পুরোপুরি নিগ্রহ করে। ইচ্ছা করিয়া তাহারা ইহা করে না, স্বভাবত ইহা করে। পশুরা শুধু ঘাস খাইয়া জীবনধারণ করে, তাও পেট ভরার মত খায়। তাহারা বাঁচিয়া থাকার জন্য খায়, খাইবার জন্য বাঁচিয়া থাকে না। পরন্তু আমরা তো ইহার উল্টা করি। মা সন্তানকে রকমারি সুস্বাদু জিনিষ খাওয়ান। তিনি মনে করেন ইহাই সন্তানের প্রতি স্নেহ দেখানর সর্ব্বোত্তম উপায়। ইহার ফলে ঐ সব জিনিষের স্বাদ বাড়ে না, কমে। স্বাদ তো থাকে ক্ষুধার ভিতর। ক্ষুধার সময় শুকনা রুটিও মিঠা লাগে; ক্ষুধা না থাকিলে মিঠা জিনিষও বিস্বাদ ঠেকে। আমরা নানারকম জিনিষ ঠাসাঠাসি করিয়া খাইয়া পেট বোঝাই করি,

আর বলি, ব্রহ্মচর্য্য পালন করা যাইতেছে না। দেখিবার জন্য যে চোখ ভগবান আমাদিগকে দিয়াছেন, আমরা তাহা কলুষিত করি এবং যেসব জিনিষ দর্শনযোগ্য তাহা দেখা শিক্ষা করি না। 'মায়ের কেন গায়ত্রী না পড়া ঠিক এবং তিনি কেন সন্তানকে গায়ত্রী শিখাইবেন না?' ইহা লইয়া তর্ক বিতর্ক না করিয়া গায়ত্রীতত্ত্ব সূর্য্যোপাসনা কি, তাহা বুঝাইয়া সূর্য্যের উপাসনা করানই ভাল। সনাতনী আর্য্যসমাজী সকলেই তো সূর্য্যের উপাসনা করিতে পারে। আমি তো আপনাদের সামনে স্থূল অর্থ উপস্থিত করিয়াছি। এই উপাসনার অর্থ কি? আপনার শির উচু করিয়া সূর্য্যরূপ নারায়ণকে দর্শন করিয়া চক্ষু শুদ্ধ করাই এই গায়ত্রীর উদ্দেশ্য। গায়ত্রী রচয়িতা ঋষি ছিলেন, দ্রষ্টা ছিলেন। তিনি কহিয়াছেন সূর্য্যোদয়ে যে নাটক যে সৌন্দর্য্য যে লীলার অভিনয় হয়, তাহা আর কোথাও হয় না। ভগবানের ন্যায় চিত্রশিল্পী এবং আকাশের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রঙ্গভূমি কোথাও নাই। কিন্তু কোন্ মা সন্তানের চোখ ধোয়াইয়া তাহাকে আকাশ দর্শন করাইয়া থাকেন? ইহা ভিন্ন মায়ের ভালবাসার ভিতব তো মোহ আছে। ঘরে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, শিশুরা তাহাই শিক্ষা করিবে। কিন্তু কয়জনে একথা ভাবে, জানা অজানা যত কথা বালক শোনে, তার মধ্য হইতে সে কতকগুলি কথা শিখিবে। মা-বাপ আমাদের শরীরকে নানা রকম পোষাক দিয়া সাজান। কিন্তু ইহাতে শোভা বাড়ে কই? শীতাতপ হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা কাপড় ব্যবহার করি, সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য নহে। বালককে যখন আমরা অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসাইয়া দিব, অথবা খেলাধুলায় যোগ দিতে পাঠাইব, কিম্বা ক্ষেতের কাজে লাগাইয়া দিব, তখন তার শরীর বজ্রের ন্যায় হইবে। যিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তার শরীর অবশ্য

বজ্রের ন্যায় দৃঢ় হয়। আমরা তো ছেলে-পিলের শরীর নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি। আমরা তাহাদিগকে ঘরে বসাইয়া রাখিয়া ননীর পুতুল বানাইতেছি। অতিমাত্রায় আদর দিয়া সন্তানের শরার বিগড়াইয়া দিতেছি।

ইহা তো হইল কাপড়ের কথা। বাড়ীতে নানারকম কথা বলিয়া তাহাদের মন খারাপ করিয়া দিতেছি। আমরা তাহাদিগকে বিবাহের কথা বলি, এবং এইরূপ ব্যাপার ও দৃশ্য তাহারা দেখে। আমি তো আশ্চর্য্য হইয়া যাই যে, আমরা কেন আরও বর্ব্বর হইয়া যাই নাই! নীতির বন্ধন নষ্ট করার চেষ্টা সত্ত্বে, ইহা রক্ষা পায়। ভগবান মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, ধ্বংসের অনেক কারণ ঘটিলেও, সে বাঁচিয়া যায়। তাঁর লীলা রহস্যময়। এইসব বাধা যদি আমরা দূর করিতাম, তবে ব্রহ্মচয্য পালন করা খুব সহজ হইত।

আমাদের অবস্থা এরূপ হওয়া সত্ত্বে আমরা দুনিয়ার সহিত শারীরিক বল-পরীক্ষায় নামিতে চাই। ইহার দুটি পথ আছে—একটি আসুরিক অপরটি দৈবী। শারীরিক শক্তিবৃদ্ধির জন্য গোমাংস প্রভৃতি নানারূপ খাদ্য গ্রহণ করা, কুস্তি প্রভৃতি করা আসুরিক পথ। বাল্যকালে আমার এক মিত্র আমাকে বলিয়াছিলেন, আমাদিগকে অবশ্য মাংসাহার করিতে হইবে, নহিলে ইংরেজের মত হৃষ্টপুষ্ট হইতে পারিব না। ভিন্ন দেশের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, জাপানেও গোমাংস খাওয়া আরম্ভ হইয়াছিল। যদি আসুরিক উপায়ে শরীর তৈরী করিবার ইচ্ছা হয়, তবে এইসব জিনিষ খাইতে হইবে।

পরন্তু যদি দৈবী সাধনার পথে শরীর তৈরী করিতে চাই, তবে ব্রহ্মচর্য্যই তার উপায়। যখন আমাকে কেহ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে, তখন নিজের উপর আমার কৃপা হয়। মান-পত্রে আমাকে

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলা হইয়াছে। একথা বলা দরকার, যিনি মান-পত্রের মুসাবিধা করিয়াছেন তিনি জানেন না, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য কাহাকে বলে। যাহার সন্তান হইয়াছে, তাহাকে কিরূপে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী কহা যায়? নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর তো কখনও জ্বর হয় না, মাথা ধরে না, আমাশয় ও এপেণ্ডিসাইটিস্ হয় না। ডাক্তারগণ বলেন, কমলালেবুর রস অন্ত্রের মধ্যে থাকিয়া গেলেও এপেণ্ডিসাইটিস্ হইতে পারে। যার শরীর নীরোগ, তার শরীরে এই জিনিষ থাকিতে পারে না। অন্ত্র শিথিল হইলে, এইসব জিনিষ আপনা হইতে বাহির হয় না। অন্ত্র শিথিল হইয়াছিল বলিয়া আমার এপেণ্ডিসাইটিস্ হইয়াছিল। যাহা সহজে হজম হয় না,ছেলেপিলে এমন জিনিষ অনেক খায়। মা তার খোঁজ রাখে কই? তবে তাহাদের অন্ত্রের স্বাভাবিক শক্তি অনেক বেশী। আমি চাই আমাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলিয়া যেন কেহ মিথ্যাচারী না হন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর তেজ তো আমার অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী হইবে। আমি আদর্শ ব্রহ্মচারী নহি। এ কথা সত্য যে, আমি এইরূপ হইতে চেষ্টা করিতেছি। ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া আমি তো আপনাদের সামনে আমার নিজের অভিজ্ঞতা কিছু পেশ করিলাম। ব্রহ্মচারী হওয়ার অর্থ ইহা নহে যে, কোনো স্ত্রীলোক অথবা আপনার ভগ্নীকে স্পর্শ করিব না। কাগজ স্পর্শ করিলে যেমন মনে কোনো বিকার উৎপন্ন হয় না, স্ত্রীলোক স্পর্শ করিলে ব্রহ্মচারীর তেমনি কোনো বিকার হইবে না। ভগ্নীর ব্যারামে, তার সেবা করিতে গিয়া যদি ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয়, তবে এই ব্রহ্মচর্য্যের মূল্য তিন কড়া কড়ি। কোনো মৃত শরীর স্পর্শ করিয়া যেরূপ নির্বিকার থাকিতে পারি, কোনো পরমা সুন্দরী যুবতীর শরীর স্পর্শ করিয়া সেইরূপ নির্বিকার থাকিতে পারিলে আমরা ব্রহ্মচারী।

ব্রহ্মচারী স্বভাবত সন্ন্যাসী। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সন্ন্যাসাশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পরন্তু আমরা ইহার মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছি। ফলে আমাদের গৃহস্থ বাণপ্রস্থাশ্রম নষ্ট হইয়াছে এবং সন্ন্যাসাশ্রমের নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। আমাদের অবস্থা এত শোচনীয়।

উপরে যে আসুরিক পথের কথা বলিয়াছি, সে পথে চলিতে গেলে আপনারা পাঁচ শ বছর তক পাঠানদের * সহিত লড়াই করিতে সক্ষম হইবেন না। দৈবী পথে চলিলে, আজই তাহাদের সহিত লড়াই করিতে পারিবেন। কারণ দৈবী সাধন দ্বারা এক মুহূর্ত্তের মধ্যেও প্রয়োজনীয় মানসিক পরিবর্ত্তন হইতে পারে। কিন্তু শারীরিক পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইলে অনেক সময় দরকার। যখন আমাদের ভিতর পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পুণ্য থাকিবে, এবং পিতামাতারা আমাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবেন, তখন আমরা দৈবীপথে চলিতে পারিব।

হিন্দী-নবজীবন—২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

* মহাত্মাজী বোধহয় এখানে ভারতের বাহিরের পাঠানদের সহিত হিন্দু-মুসলমান সকলের বিরোধের কথা ইঙ্গিত করিতেছেন—অনুবাদক।

সত্য বনাম ব্রহ্মচর্য্য

কোনো বন্ধু মহাদেও দেশাঈকে লিখিয়াছেন :—

"আপনার স্মরণ হইতে পারে, কয়েক মাস পূর্ব্বে নবজীবনের একটি প্রবন্ধে গান্ধীজী লিখিয়াছিলেন, তিনি তখনও দুঃস্বপ্ন দেখেন। ইহা পড়িয়া আমার মনে হইয়াছিল, এরূপ কথা প্রকাশ করার ফল কখনও ভাল হইতে পারে না। যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

"বিলাত-প্রবাস কালে আমার দুই বন্ধু ও আমি, অনেক প্রকার প্রলোভন সত্ত্বে, চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিয়াছিলাম। মদ মাংস ও স্ত্রীলোক হইতে আমরা সম্পূর্ণরূপে দূরে ছিলাম। কিন্তু গান্ধীজীর ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া, আমার এক বন্ধু সম্পূর্ণরূপে হতাশ হইয়া বলিয়াছিলেন, 'বিপুল চেষ্টার পর গান্ধীজীর অবস্থা যদি এমন হয়, তবে আমরা কি করিতে পারি? ব্রহ্মচর্য্যপালন করার চেষ্টা করা বৃথা। গান্ধীজীর ত্রুটী স্বীকার আমার সমস্ত ধারণা বদলাইয়া দিয়াছে। আজ হইতে আমি গোল্লায় গেলাম ধরিয়া লইও।' আমার মুখ মলিন হইল। সঙ্কোচের সহিত তাহাকে বলিলাম, 'গান্ধীজীর পক্ষেও এই পথে চলা যদি শক্ত হয়, তবে আমাদের পক্ষে আরও শক্ত। এজন্য আমরা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে চেষ্টা করিব।' আপনি এবং গান্ধীজীও বোধ হয় এইরূপ যুক্তি দেখাইতেন। কিন্তু এসবই বৃথা হইল। এ পর্য্যন্ত যে চরিত্র সুন্দর ও নিষ্কলঙ্ক ছিল তাহা কলঙ্কিত হইল। যদি কেহ গান্ধীজীকে

এজন্য দায়ী করে, তবে গান্ধীজী অথবা আপনি ইহার কি জবাব দিবেন ?

"যত দিন পর্য্যন্ত আমি এই একটি ঘটনা জানিতাম, ততদিন পর্য্যন্ত আপনাকে কিছু লিখি নাই। তখন লিখিলে, আপনি হয়ত বলিতেন, একটি ঘটনা দেখিয়া কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না। কিন্তু ঐ লেখা বাহির হওয়ার পর, এইরূপ আরও ঘটনা দেখিয়া, আমার ধারণা যে ঠিক, তাহাই মনে হইতেছে।

"জানি, গান্ধীজীর পক্ষে অনেক কাজ খুব সহজ হইলেও, আমার পক্ষে সে-সব অসম্ভব। কিন্তু ভগবানের কৃপায় ইহাও সম্ভব হইতে পারে, যে-কাজ গান্ধীজী করিতে অক্ষম, সেইরূপ এক আধটা কাজ আমি করিতে পারি। গান্ধীজীর পক্ষে যাহা অসাধ্য, তাহা আমার পক্ষে সাধ্য হইতে পারে, এই অভিমান আমাকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিয়াছে। অবশ্য গান্ধীজীর স্বীকারোক্তি পড়িয়া আমার অন্তর বিলোড়িত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে নিরাপদে থাকিতে পারিব কিনা তাহাতে সন্দেহ হইতেছে।

"কৃপা করিয়া একথা এখন গান্ধীজীকে বলিবেন। বিশেষতঃ এ সময় তিনি তাঁহার আত্মজীবনী লিখিতেছেন। খাঁটি সত্য বলায় বাহাদুরী আছে, কিন্তু 'নবজীবন' ও 'ইয়ংইণ্ডিয়ার' পাঠকগণ এবং মানব জাতির পক্ষে ইহার ফল খারাপ হইবে। যাহা একের খাদ্য তাহা অন্যের পক্ষে বিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইতে পারে।"

এই অভিযোগ নূতন নহে। অসহযোগ আন্দোলন জোরে চলিবার সময় যখন আমি আমার ত্রুটি স্বীকার করিয়াছিলাম, তখন কোনো বন্ধু সরলভাবে লিখিয়াছিলেন, 'আপনার ভুল হইলেও, তাহা স্বীকার করা উচিত হয় নাই। লোকের এ বিশ্বাস জন্মান

উচিত যে, অন্ততঃপক্ষে এমন একটি লোক আছেন, যিনি কখনও ভুল করেন না। লোকে আপনাকে সেইরূপ ভাবিত। আপনার ত্রুটি স্বীকারের জন্য তাহারা হতাশ হইবে।' এই পত্র পড়িয়া আমার হাসি কান্না দুইই আসিয়াছিল। লেখকের সরলতা দেখিয়া আমার হাসি পাইয়াছিল। নিখুঁত লোক না মিলিলে, যাহার গলদ আছে এরূপ লোককে নিখুঁত বলিয়া চালাইতে হইবে এরূপ চিন্তায় আমাকে দুঃখ দিয়াছিল।

আমার ত্রুটী থাকিলে এবং তাহা লোকে জানিলে, তাহাদের ক্ষতির বদলে লাভ হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, তাড়াতাড়ি ত্রুটী স্বীকার করায় জনসাধারণের লাভ হইয়াছে। নিজের সম্বন্ধে বলিতে গেলে বলিব, ইহাতে আমার যথেষ্ট লাভ হইয়াছে।

আমার কুস্বপ্ন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। পূর্ণ ব্রহ্মচারী না হইয়াও, যদি আমি ইহা দাবী করিতাম, তবে ইহাতে সংসারের বড় ক্ষতি হইত। ইহাতে ব্রহ্মচর্য্য কলঙ্কিত হইত এবং সত্যের জ্যোতি ম্লান হইত। ব্রহ্মচারী হওয়ার মিথ্যা দাবী করিয়া আমি কেন ব্রহ্মচর্য্যের মূল্য কমাইব? এখন আমি স্পষ্টই দেখিতেছি, ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য আমি যে উপায় অবলম্বনের কথা বলিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ নহে এবং সব ক্ষেত্রে ইহা সম্পূর্ণরূপে সফল হইবে না, কারণ আমি স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্মচারী নহি। দুনিয়া যদি আমাকে পূর্ণ ব্রহ্মচারী ভাবে এবং আমি যদি ব্রহ্মচর্য্য পালনের শ্রেষ্ঠ উপায় দেখাইতে না পারি, তবে মহা অন্যায় হইবে।

আমি সদাজাগ্রত সাচ্চা সাধক, ব্রহ্মচর্য্য লাভের জন্য নিরন্তর দৃঢ়ভাবে কঠোর চেষ্টা করিতেছি। এইটুকু জানিলেই বা সকলে উৎসাহিত হইবে না কেন? মিথ্যা যুক্তি হইতে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছা

ঠিক নহে। যাহা কেহ করিয়াছে, তাহা দেখিয়া জ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কেন এরূপ বলা হয় যে, আমার মতন লোক কুচিন্তা হইতে যদি মুক্ত না হইতে পারে, তবে অপরে কি করিয়া পারিবে? এই গলদপূর্ণ তর্ক না করিয়া, ইহাই বলেন না কেন যে-গান্ধী এককালে রিপুর দাস ও ব্যভিচারী ছিল সেই গান্ধী যখন বর্ত্তমানে আপনার পত্নীর সহিত বন্ধু এবং ভাইএর ন্যায় বাস করিতে পারে, এবং অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী নারীকে কন্যা অথবা ভগ্নী মনে করিয়া তাহার সহিত একসঙ্গে থাকিতে পারে, তখন আমরাও কেন ইহা পারিব না? হীন মহাপাতকীরও উদ্ধারের আশা আছে। আমার কুচিন্তা ভগবান দূর করিবেন, ইহাই হইল সোজা হিসাব।

লেখকের যে-মিত্রেরা আমার গলদের কথা শুনিয়া পিছনে হটিয়াছেন ভাবিতেছেন, তাহারা কখনও অগ্রসর হন নাই। তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা সামান্য আঘাতেই নষ্ট হইয়াছে। সাচ্চা ব্রহ্মচর্য্যসাধন এবং এইরূপ মহান্ ব্রতপালন আমার ন্যায় অসম্পূর্ণ ব্যক্তির উপর নির্ভর করে না। তাহার পিছনে অসংখ্য লোকের কঠোর তপশ্চর্য্যা এবং আদর্শ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর সাধনা রহিয়াছে।

এই সব আদর্শ মানবের পংক্তিতে দাঁড়াইবার অধিকার যখন আমার হইবে, তখন আমার ভাষার দৃঢ়তা ও শক্তি আরও বাড়িবে। যিনি কখনো কোনো খারাপ চিন্তা করেন না, যার চিন্তা সংযত, যিনি স্বপ্ন দেখেন না, যিনি নিদ্রাবস্থায়ও জাগ্রত থাকিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত স্বাস্থ্যবান। তাঁহার কুইনিন সেবন করা দরকার হয় না। নির্বিকারীর রক্ত এরূপ শুদ্ধ যে, তাঁহার শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশ করিতে পারে না। এইরূপ সম্পূর্ণ সুস্থ শরীর মন ও আত্মালাভের জন্য আমি চেষ্টা করিতেছি। ইহার ভিতর পরাজয় বা

বিফলতার কোনো কথা নাই। এই চেষ্টায় যোগ দিবার জন্য,আমি পত্র-লেখককে, তাঁহার বন্ধুদিগকে এবং অপরকেও অনুরোধ করিতেছি এবং আমি ইচ্ছা করি লেখকের ন্যায় তাঁহারাও দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হউন। যাঁহারা পিছনে পড়িয়া আছেন, তাঁহারা আমার দৃষ্টান্তে যেন আত্মবিশ্বাসী হন। আমার দুর্ব্বলতা এবং ইন্দ্রিয়ের অধীন হওয়া সত্বে, নিরন্তর চেষ্টা এবং ভগবানের করুণায় অনন্ত বিশ্বাসের ফলে, আমি সামান্য সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছি।

এজন্য কেহ যেন নিরাশ না হন। আমার 'মহাত্মা' হওয়ার কোনো অর্থ নাই। আমার বাহিরের কাজের জন্য—রাজনৈতিক কাজের জন্য, আমি ইহা পাইয়াছি। ইহা ক্ষণস্থায়ী। সত্য, অহিংসা এবং ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি নিষ্ঠা আমার অন্তরতম জিনিষ—ইহাই আমার অবিচ্ছিন্ন জিনিষ। ইহা অল্প হইলেও অনাদরের জিনিষ নহে। এ সম্বন্ধে আমি ভগবানদত্ত যাহা-কিছু পাইয়াছি, ভুল করিয়াও তাহার প্রতি যেন কেহ অবজ্ঞা না দেখান—কারণ ঐ অল্পই আমার যথাসর্ব্বস্ব। এই সম্পর্কে আমার অকৃতকার্য্যতা ও ভ্রমপ্রমাদকেও অমি সফলতার চাবি মনে করি ; ইহার জন্য নিস্ফলতাও আমার প্রিয়।

হিন্দী-নবজীবন, ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯২৬—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

পবিত্রতা

ব্রহ্মচর্য্য এবং ইহা প্রাপ্তির উপায় জানিবার জন্য আমার নিকট অসংখ্য চিঠি আসিতেছে। পূর্ব্বে আমি যাহা বলিয়াছি অথবা লিখিয়াছি, নূতন ভাবে তাহার পুনরালোচনা করিব। কলের ন্যায় শরীর সংযম করাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে না। ইহার অর্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পূর্ণসংযম—কায়মনোবাক্যে ইন্দ্রিয়বিকার হইতে মুক্তি। এই হিসাবে ইহা আত্ম-দর্শন বা ভগবদ্‌প্রাপ্তির পাকা সড়ক। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি অথবা সন্তানোৎপাদনের ইচ্ছার সহিত ব্রহ্মচারীকে আদৌ লড়িতে হয় না; ইহা তাঁহাকে মোটেই জ্বালাতন করে না। সারা দুনিয়া তার নিকট এক বিশাল পরিবারের ন্যায় ঠেকে। মানবের দুঃখদুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য তিনি তাঁহার সব উচ্চাশাকে কেন্দ্রীভূত করেন। সন্তানোৎপাদন ইচ্ছা তাঁহার নিকট বিষবৎ মনে হয়। যিনি মানবসমাজের বিশালতা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি কখনও ইন্দ্রিয়ের দাস হন না। তিনি সহজাত সংস্কাররূপে আপনার শক্তির উৎস কোথায় তা জানেন এবং ইহাকে নিষ্কলঙ্ক রাখার জন্য সব সময় চেষ্টিত থাকেন। জগৎ তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তিকে সম্মান করে। দণ্ডধারী রাজা অপেক্ষা তাঁহার প্রভাব বেশী।

কিন্তু আমাকে বলিতে পারেন, এই আদর্শে পৌছান অসম্ভব এবং

স্ত্রী-পুরুষের ভিতরকার স্বাভাবিক আকর্ষণকে আমি হিসাবে ধরি নাই। আমি ইহা বিশ্বাস করি না যে, স্ত্রী-পুরুষের ভিতরকার এই আকর্ষণ স্বাভাবিক; ইহা সত্য হইলে বুঝিব প্রলয়ের বেশী দেরী নাই। ভাই-বোন, মাতা-পুত্র ও পিতা-পুত্রীর ভিতর যে আকর্ষণ আছে, তাহাই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক আকর্ষণই দুনিয়াকে রক্ষা করিতেছে। সমস্ত নারীজাতিকে আমি যদি ভগ্নী, কন্যা অথবা মায়ের ন্যায় ভাবিতে না পারিতাম, তবে কাজ করাতো দূরের কথা, বাঁচিয়া থাকাই আমার পক্ষে অসম্ভব হইত। যদি কামদৃষ্টিতে তাহাদের দিকে তাকাইতাম তবে ইহা সুনিশ্চিতরূপে আমাকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইত।

সন্তানোৎপাদন স্বাভাবিক ব্যাপার; কিন্তু ইহার একটা সীমা আছে। এই সীমা লঙ্ঘন করিলে নারীকে বিপন্ন ও সমাজকে শক্তি-হীন করা হয়। ইহা ব্যাধি সৃষ্টি করে, পাপকে চিত্তাকর্ষক করে এবং দুনিয়াকে অধর্ম্মের পথে লইয়া যায়। ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তির অবস্থা হালশূন্য জাহাজের ন্যায়। এইরূপ কোনো লোক যদি সমাজকে চালাইতে যায়, গাদাগাদা বই লেখে, এবং লোকে যদি তাহার কথা মত চলে, তবে সমাজের অবস্থা শোচনীয় হইবে। তথাপি ঠিক এই সব ব্যাপার ঘটিতেছে। ক্ষণস্থায়ী আনন্দের চিন্তায় তন্ময় হইয়া আলোকের চারিপাশে ঘুরিতে ঘুরিতে পোকার যে অবস্থা হয়, ক্ষণিক সুখের আশায় ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির পথে চলিতে চলিতে আমাদেরও সেই দশা হইবে। আমি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিব, স্বামী-স্ত্রীর ভিতরকার যৌন আকাঙ্ক্ষাও অস্বাভাবিক। মনকে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হইতে মুক্ত করা এবং দম্পতিকে ভগবানের নিকট লইয়া যাওয়াই বিবাহের উদ্দেশ্য। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পবিত্র কামগন্ধহীন প্রেম

থাকা অসম্ভব নহে। মানুষ পশু নহে। অসংখ্য পশুযোনি ভ্রমণ করার পর, সে উচ্চস্তরে উঠিয়াছে। তাহাকে চারি পায়ে ভর দিয়া অথবা হামাগুড়ি দিয়া চলিতে হয় না, সে দাঁড়াইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। জড়পদার্থ ও আধ্যাত্মিকতায় যে প্রভেদ, পশুত্ব ও মনুষ্যত্বে সেই প্রভেদ।

পরিশেষে ব্রহ্মচর্য্য লাভের উপায় সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে কিছু বলিব।

ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাই প্রথম সোপান।

তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করিতে হইবে। ব্রহ্মচারীকে রসনেন্দ্রিয় সংযম করিতে হইবে। তিনি বাঁচিয়া থাকার জন্য খাইবেন, ভোগের জন্য নহে। তিনি শুধু পবিত্র জিনিষ দেখিবেন, এবং অপবিত্র কিছু দেখিলে চোখ বুজিবেন। এদিক ওদিক না তাকাইয়া মাটির দিকে চাহিয়া পথ চলাই সুশিক্ষার চিহ্ন; তিনি কোনো কু অথবা অপবিত্র কথা শুনিবেন না; কোনো উগ্র বা উত্তেজক জিনিষের গন্ধ লইবেন না। পরিষ্কার মাটীর গন্ধ, কৃত্রিম সুগন্ধিদ্রব্য অথবা গন্ধসার অপেক্ষা অনেক মধুর। যিনি ব্রহ্মচারী হইতে ইচ্ছুক, তিনি যেন সব সময় নিজের শরীরকে স্বাস্থ্যপ্রদ কাজে নিযুক্ত রাখেন, এবং মধ্যে মধ্যে উপবাসও করেন।

তৃতীয় উপায় সৎসঙ্গী ও সৎবন্ধুর সহিত থাকা এবং সৎগ্রন্থ পাঠ।

শেষ উপায় উপাসনা। ইহার মূল্য কোনোটির অপেক্ষা কম নহে। ব্রহ্মচারী যেন সর্ব্বান্তকরণে প্রত্যেকদিন নিয়মিত রূপে ভগবানের নাম করেন ও তাঁর করুণা ভিক্ষা করেন।

স্ত্রী-পুরুষ কাহারও পক্ষে ইহার কোনোটা পালন করা শক্ত নহে।

এগুলি সহজসাধ্য। কিন্তু সহজ বলিয়াই মুস্কিলে পড়িতে হয়। সঙ্কল্প থাকিলে, উপায় সহজে বাহির হয়। লোকে ইহা চায় না, সে জন্য অন্ধকারে বৃথা হাতড়াইয়া বেড়ায়। অল্পবিস্তর 'ব্রহ্মচর্য্য বা সংযমরক্ষার উপর যখন জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করে, তখন বলা চলে ইহা প্রয়োজনীয় এবং পালন করাও সম্ভবপর।

ইয়ং ইণ্ডিয়া—২৯ এপ্রিল, ১৯২৬—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

জীবনী-শক্তি সঞ্চয়

এইরূপ বিষয় প্রকাশ্যভাবে আলোচনা করিতেছি বলিয়া পাঠকগণ যেন আমাকে ক্ষমা করেন। গোপনে ইহা আলোচনা করিতে পারিলে সুখী হইতাম। কিন্তু বাধ্য হইয়া আমি যে সাহিত্য পাঠ করিয়াছি এবং শ্রীযুক্ত বুরো * সাহেবের পুস্তক সমালোচনার পর আমি যে-সব চিঠি পাইয়াছি, তাহাতে সমাজের এই পরম হিতকর প্রশ্ন প্রকাশ্যভাবে আলোচনা করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এক মালাবারী ভাই লিখিতেছেন :

"শ্রীযুক্ত বুরোর বই সমালোচনার সময় আপনি লিখিয়াছেন, ব্রহ্মচর্য্য বা দীর্ঘকাল সংযম পালন করার ফলে কাহারও কোনো ক্ষতি হইয়াছে এরূপ একটি দৃষ্টান্ত নাই। তিন সপ্তাহের বেশী সংযম পালন করা আমার পক্ষে অনিষ্টকর মনে হয়। তিন সপ্তাহ পরে আমার শরীর প্রায়ই ভার ঠেকে, মন ও শরীর চঞ্চল হয় এবং মেজাজও একটু বিগড়াইয়া যায়। সম্ভোগ দ্বারা অথবা অনিচ্ছাপ্রসূত বীর্য্যপাত হইলে আরাম পাই। পরদিন প্রাতে শরীর ও মন দুর্ব্বল না হইয়া শান্ত ও হালকা হয় এবং বেশী উৎসাহের সহিত আমার নিয়মিত কাজ করিতে পারি।

"সংযমই আমার এক বন্ধুর যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়াছে। তাহার

---

* M. Paul Bureau নামক ফরাসি লেখকের একখানা বইএর ইংরেজী অনুবাদের (Towards Moral Bankruptcy) সমালোচনা গান্ধীজী ইয়ং ইণ্ডিয়ায় করেন—অনুবাদক।

বয়স বত্রিশ বৎসর। তিনি নিরামিষাশী, নিষ্ঠাবান ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। সব রকম শারীরিক অথবা মানসিক কু অভ্যাস হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তথাপি স্বপ্নদোষ হইয়া তাঁহার বহুত বীর্য্যপাত হইত। তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। শেষে তাঁহার তলপেটে ভয়ানক বেদনা পর্য্যন্ত হয়। ইহা দুই বৎসর পূর্ব্বের কথা। এক আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি বিবাহ করেন। এখন সম্পূর্ণ ভাল আছেন।

"আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র সমূহ ব্রহ্মচর্য্যকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছে—একথা আমি বিচারবুদ্ধির সাহায্যে ধারণা করিতে পারি। কিন্তু উপরে বর্ণিত অভিজ্ঞতা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, শুক্রগ্রন্থি হইতে যে বীর্য্য উৎপন্ন হয়, তাহা হজম করিয়া শরীরের ভিতর রাখিবার শক্তি আমাদের নাই। এজন্য ইহা বিষের মত কার্য্য করে। অতএব আপনার নিকট সবিনয় অনুরোধ, ব্রহ্মচর্য্য ও আত্মসংযমের মূল্য সম্বন্ধে যাহাদের সন্দেহ নাই, সেইরূপ আমার মতন লোকের সুবিধার জন্য হঠযোগ অথবা প্রাণায়ামের মত কোনো সাধনা সম্বন্ধে কিছু বলুন। ইহার সাহায্যে আমরা শরীরের এই প্রাণ-শক্তিকে রক্ষা করিতে পারিব।"

পত্রলেখকের দৃষ্টান্তগুলি অসাধারণ নহে। অনেকের জীবনে এরূপ ঘটিয়া থাকে। অনেক স্থলে অসম্পূর্ণ ঘটনা হইতে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা দেখিয়াছি। প্রাণশক্তি শরীরের ভিতর রাখা ও হজম করা বহু সময় ও অভ্যাস-সাপেক্ষ। ইহার অন্যথা হইতে পারে না; কারণ ইহা শরীর ও মনকে যত শক্তিশালী করে, তাহা আর কিছুতেই পারে না। ঔষধপত্রাদি শরীরকে সাধারণ অবস্থায় রাখিতে পারে, কিন্তু ইহাতে চিত্তের দুর্ব্বলতা এত বাড়ে যে,

মন ইন্দ্রিয়ের সহিত লড়াই করিতে সক্ষম হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই সব ইন্দ্রিয় মারাত্মক শত্রুর ন্যায় ঘিরিয়া রহিয়াছে।

আমরা অনেক সময় এরূপ কাজ করি, যাহাতে আমাদের উপকার না হইয়া অপকারই বেশী হয়। তথাপি আমরা ভাল ফল চাই। আমাদের জীবনযাপন প্রণালী এরূপ, যাহাতে সহজে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়। আমাদের ভোজন, সাহিত্য, আমোদ-প্রমোদ কাজকরার সময় এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত যে, এইগুলি আমাদের পাশবিক বাসনার উত্তেজনা ও খোরাক যোগায়। আমাদের মধ্যের বেশীর ভাগ লোকের ইচ্ছা বিবাহ করা, সন্তান উৎপাদন করা এবং খুব পরিমিত হইলেও সুখভোগ করা। আখের তক এই ব্যাপার কমবেশী চলিবে।

কিন্তু সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম চিরকালই থাকে। এমন লোকও দেখা গিয়াছে, যাহারা মানবজাতি অর্থাৎ ভগবানের সেবার জন্য সম্পূর্ণরূপে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহারা সমগ্র মানব সমাজ ও নিজের পরিবারের সেবার মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখিতে চান না। ইঁহারা ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির উপযোগী জীবন যাপন করিতে পারেন না। যাঁহারা ভগবানের সেবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে শৈথিল্য-ত্যাগ এবং কঠোর সংযমের ভিতর সুখের সন্ধান করিতে হইবে। তাঁহারা দুনিয়ায় থাকিবেন, কিন্তু দুনিয়ার পথে চলিবেন না। তাহাদের খাদ্য, কাজ, কাজের সময়, আমোদ-প্রমোদ, সাহিত্য, জীবনের উদ্দেশ্য অপর সাধারণ হইতে বিভিন্ন প্রকার হইবে।

এখন দেখিতে হইবে পত্রলেখক ও তাঁহার বন্ধু পূর্ণ-ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন কি না, এবং নিজেদের জীবনকে সেই পথে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না। যদি না করিয়া থাকেন, তবে একথা বুঝা শক্ত নহে, কেন বীর্যপাতের ফলে প্রথম ব্যক্তির আরাম

ও দ্বিতীয় ব্যক্তির দুর্ব্বলতা দেখা দিয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে বিবাহই ছিল প্রতিকারের উপায়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে মন যদি বিবাহ-সুখের চিন্তায় পূর্ণ থাকে, তবে এ অবস্থায় অধিকাংশ মানুষের' বিবাহ করাই ঠিক। যে চিন্তাকে সংযত করা যাইতেছে না, অথচ যাহাকে মূর্ত্ত করা হয় নাই, তার শক্তি, যে চিন্তাকে মূর্ত্ত এবং কাজে পরিণত করা হইয়াছে,তার অপেক্ষা অনেক বেশী। কাজকে যথোচিত সংযত করা হইলে, চিন্তার উপর ইহার প্রভাব পড়ে এবং ইহা চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। কার্য্যে পরিণত হইলে চিন্তার অবস্থা হয় কয়েদীর মত—তখন চিন্তা আয়ত্তাধীন হয়। এই হিসাবে বিবাহ এক প্রকার সংযম।

যাঁহারা নিয়মিতভাবে সংযত জীবন যাপন করিতে চান, তাঁহাদের জন্য খবরের কাগজের প্রবন্ধে আমি খুঁটিনাটী পরামর্শের কথা লিখিতে পারি না। এই উদ্দেশ্যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লেখা আমার **'আরোগ্য নীতি'** তাঁহাদিগকে পড়িতে বলি। নূতন অভিজ্ঞতা অনুসারে ইহার কয়েকস্থান পুনর্লিখিত হওয়া উচিত, কিন্তু ইহার ভিতর এমন কিছু নাই, যাহা আমি বাদ দিতে ইচ্ছা করি। সাধারণ নিয়মগুলি আমি নীচে দিতেছি।

(১) পরিমিত ভোজন করিবে। অল্প ক্ষুধা থাকিতেই খাওয়া ছাড়িয়া উঠিবে।

(২) বেশী গরম মশলা এবং ঘৃতৈতল যুক্ত নিরামিষ খাদ্যও ত্যাগ করিবে। যথেষ্ট দুধ মিলিলে, ঘৃতৈতল প্রভৃতি চর্ব্বিজাতীয় পদার্থ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। যখন জীবনীশক্তির অল্প অপব্যয় হয়, তখন অল্প আহারই যথেষ্ট।

(৩) পবিত্র কাজে মন ও শরীরকে নিযুক্ত রাখিবে।

(৪) সকালে ঘুম হইতে উঠিবে এবং সকালে শুইবে।

(৫) সর্ব্বোপরি, সংযত জীবন কাটাইতে হইলে, ভগবদ্‌প্রাপ্তির জন্য প্রবল আকাঙ্খা থাকা চাই। যখন এই পরম তত্ত্ব প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায়, তখন হইতে ভগবানের উপর এই নির্ভরতা আসে যে, তিনি নিজে মানুষকে পবিত্র ও কর্ম্মশীল রাখিবেন।

গীতায় আছে—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥

'উপবাস সত্ত্বে ইন্দ্রিয় পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসে। কিন্তু পরম পদার্থ ভগবানকে দেখিলে, বিষয়-বাসনা চলিয়া যায়।' ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

পত্রলেখক আসন ও প্রাণায়ামের কথা বলিয়াছেন। আমি বিশ্বাস করি, আত্মসংযম অভ্যাস করার পক্ষে ইহার প্রয়োজন আছে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা যাহা আছে তাহা লেখার যোগ্য নহে। যতটুক আমি জানি, তাহাতে মনে হয়, বর্ত্তমান অভিজ্ঞতা লইয়া লিখিত কোনো বই এই বিষয়ে নাই। ইহা গবেষণা-যোগ্য। কিন্তু অনভিজ্ঞ পাঠকদিগকে ইহা প্রয়োগ করিতে, অথবা যে-কোনো হঠযোগীর সাক্ষাৎ পাইলেই, তাহাকে গুরু বলিয়া মানিয়া তার নিকট পরামর্শ লইতে আমি নিষেধ করি। তাহারা নিশ্চিত ভাবে জানিয়া রাখুন, সংযত ও ধর্ম্মজীবন যাপন করাই সংযম পালন করার পক্ষে যথেষ্ট।

ইয়ং ইণ্ডিয়া. ২ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬,—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

এখন আসিল ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে ভাবনা। বিবাহের সময় হইতে আমার হৃদয়ে এক-পত্নী-ব্রত স্থান পাইয়াছিল। আমার সত্যব্রতের এক অঙ্গই ছিল পত্নীর প্রতি বিশ্বস্ততা। কিন্তু নিজের স্ত্রীর সহিত ব্রহ্মচর্য্য পালন করার গুরুত্ব আমি দক্ষিণ আফ্রিকাতেই পরিষ্কার ভাবে বুঝি। আমার ঠিক ঠিক স্মরণ হইতেছে না কি প্রসঙ্গে অথবা কোন পুস্তক পাঠে আমার এ চিন্তা আসে। তবে মনে পড়িতেছে এই সম্বন্ধে রায় চাঁদ ভাইএর প্রভাব আমার উপর যথেষ্ট পড়িয়াছিল।

তাঁহার সঙ্গের একটি কথা মনে আছে। এক সময় আমি শ্রীযুক্ত গ্লাডষ্টোনের প্রতি শ্রীমতী গ্লাডষ্টোনের প্রেমের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার বড় প্রশংসা করি। আমি বলিয়াছিলাম, পার্লামেণ্টের বৈঠকেও শ্রীমতী গ্লাডষ্টোন স্বামীর জন্য চা তৈরী করিয়া দিতেন। এই দম্পতির পক্ষে ইহাও এক দস্তুর হইয়া পড়িয়াছিল। আমি তাঁহাকে ইহা পড়িয়া শুনাইয়া তাঁহাদের দাম্পত্য প্রেমের প্রশংসা করিয়াছিলাম। রায় চাঁদ ভাই বলিয়াছিলেন, 'ইহার ভিতর প্রশংসার কি দেখলে তুমি? শ্রীমতী গ্লাডষ্টোনের পাতিব্রত্য ও সেবাবৃত্তি, এর মধ্যে কোনটার প্রশংশা কর? কিন্তু ঐ মহিলা যদি তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য অথবা ভগ্নী হতেন, এবং তাঁকে ঐ ভাবে সেবা করতেন, তবে তুমি কি বলতে? এরূপ কোনো ভৃত্য পাওয়া যায়

না কেন? কোনো পুরুষের ভিতর এইরূপ প্রেম দেখলে তোমার আনন্দ ও বিস্ময় হয় না কেন? আমি যা বল্লাম তা ভেবে দেখো।"

রায় চাঁদ ভাই বিবাহিত ছিলেন। আমার মনে পড়িতেছে, সেই মুহূর্ত্তে তাহার কথাগুলি আমার নিকট বড় কঠোর ঠেকিয়াছিল। কিন্তু ইহা আমি কখনও ভুলিতে পারি নাই। স্ত্রীর পতিভক্তি অপেক্ষা ভৃত্যের প্রভুভক্তি যে হাজারগুণ প্রশংসনীয়, তাহা আমি পরে বুঝিয়াছি। পতি-পত্নীর ভিতর অচ্ছেদ্য বন্ধন আছে, এ জন্য তাহাদের মধ্যে প্রেম থাকা আশ্চর্য্যজনক নহে। প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে এইরূপ প্রেম জন্মা খুব শক্ত। কবি রায় চাঁদের কথা ক্রমে হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল।

আম নিজেকে প্রশ্ন করিলাম, 'পত্নীর সহিত কি সম্বন্ধ রাখিব? পত্নীকে বিষয় ভোগের বস্তু বানাইলে, তার সহিত বিশ্বস্ততা থাকিল কই? যতদিন পর্য্যন্ত বিষয় বাসনার অধীন থাকিব, ততদিন পর্য্যন্ত আমার বিশ্বস্ততার কি মূল্য আছে?" একথা বলা উচিত মনে করিতেছি যে, আমার পত্নী কখনও আমাকে প্রলুব্ধ করেন নাই। এজন্য আমিই সঙ্কল্প করিতে পারিলে, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত গ্রহণ করা খুব সহজ ছিল। আমার দুর্ব্বলতা বা কামেচ্ছা আমার বাধা স্বরূপ ছিল।

বিবেক বুদ্ধি জাগ্রত হওয়ার পরেও আমি অকৃতকার্য্য হইয়াছি। আমার এই চেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য মহৎ ছিল না। এই উদ্দেশ্য ছিল সন্তান-নিগ্রহ। বিলাতে থাকিতে আমি এই সম্বন্ধে কিছু পড়িয়াছিলাম। নিরামিষ-আহার অধ্যায়ে জন্মমিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ডাক্তার এলিসনের কথা বলিয়াছি। ইহা আমার উপর কিছু সাময়িক প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু শ্রীযুক্ত হিল্‌স্ সাহেব ইহার বিরুদ্ধে প্রচার করেন। সাধনা এবং সংযম দ্বারা কিরূপে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যায় তিনি তাহা

প্রচার করেন। ইহার প্রভাবও আমার উপর পড়ে। যখন বুঝিলাম, আমি আর সন্তান চাহিনা, তখন হইতে সংযমী হইতে চেষ্টা স্থরু করিলাম।

সংযম পালন করিতে গিয়া মুস্কিলের অবধি ছিল না। আমরা পৃথক বিছানায় শোয়া আরম্ভ করিলাম। সমস্ত দিনের কাজ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে শয়নের বন্দোবস্ত করিতাম। এই সব চেষ্টায় খুব শীঘ্র ফল পাইয়াছিলাম মনে হয় না। কিন্তু এখন অতীতের দিকে চাহিয়া বলিতে পারি যে, এই রূপ বিফল চেষ্টাই আমাকে শেষকালে বল দিয়াছিল।

১৯০৬ সালে শেষ সঙ্কল্প করিলাম। তখনও সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয় নাই। স্বপ্নেও ইহার কথা ভাবি নাই। বুয়ার যুদ্ধের পর নাটালে জুলুবিদ্রোহ হয়। তখন আমি জোহান্সিস্‌বার্গে বারিষ্টারী করিতাম। মনে হইল, এই সময় আমাদের নাটাল-সরকারের সাহায্য করা দরকার। আমি সরকারকে ইহা জানাইলাম। সরকার রাজী হইলেন। সে কথা পরে বলিব। এই সেবার সময় সংযম সম্বন্ধে আমার খুব জবর ভাবনা আসে। সাথীদের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিলাম। আমার দৃঢ় ধারণা হইল, সন্তানোৎপাদন ও সন্তান-পালন দেশ-সেবার বিরোধী। আমাকে জোহান্সিসবার্গের গৃহস্থালি উঠাইতে হইল। এক মাসের ভিতর ঐ সাজান ঘর আমাকে ছাড়িতে হইল। পত্নী ও বালকদিগকে ফিনিক্সে রাখিলাম এবং ভারতীয় সেবক দল লইয়া নাটাল সৈন্যদলের সহিত চলিলাম। কঠোর কুচ-কাওয়াজ করার সময়, হঠাৎ চিন্তা আসিল, তন্ময় হইয়া লোকসেবা করিতে চাহিলে, সন্তান-সন্ততি ও অর্থপ্রাপ্তির আশা ত্যাগ করিতে হইবে এবং বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হইবে।

দেড়মাসের বেশী এই কাজে থাকিতে হয় নাই। কিন্তু আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় এই ছয় সপ্তাহ। ব্রতের মহত্ব আমি এই সময় স্পষ্টভাবে বুঝিলাম। দেখিলাম ব্রত স্বাধীনতার দ্বার, বন্ধনের দ্বার নহে। এ পর্য্যন্ত আমি কৃতকার্য্য হই নাই, তার কারণ আমার দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল না, আমার নিজের উপর বিশ্বাস ছিল না, ভগবানের করুণায়ও আমি বিশ্বাস করিতাম না। এজন্য আমার চিত্তবিকার হইত। আমি বুঝিলাম, যে ব্যক্তি ব্রতবন্ধনে আবদ্ধ নহে সে মোহপাশ কাটিতে পারে না। ব্যভিচার ত্যাগ করিয়া একপত্নীর সহিত সম্বন্ধ রাখা ব্যাপারটি যেমন, ব্রত গ্রহণ করিয়া সংযমী হওয়ার চেষ্টা করাও তেমন। 'আমি পুরুষকারে বিশ্বাস করি কিন্তু ব্রতবন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহি না'—ইহা দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির কথা। ইহার ভিতর সূক্ষ্মরূপে ভোগবাসনা লুক্কায়িত আছে। যাহা ত্যাগ করার যোগ্য, তাহা সব সময়ের জন্য ত্যাগ করায় হানি কি? যে-সাপ আমাকে কাটিবে তাহাকে আমি নিশ্চয়ই ত্যাগ করি; ত্যাগ করার জন্য চেষ্টা করিয়া আমি ক্ষান্ত হই না। আমি জানি শুধু চেষ্টায় মৃত্যু ঠেকাইবে না। খালি চেষ্টা করিব বলিলে বোঝা যায়, সাপের বিষের অনিষ্ট-কারিতা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অল্প আছে। যে বস্তু ত্যাগ করার চেষ্টামাত্র করিয়া আমি সন্তুষ্ট, সে বস্তু ত্যাগ করা যে প্রয়োজন, তাহা আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করি নাই। 'যদি আমার মত ভবিষ্যতে বদলাইয়া যায় তবে কিরূপে শপথ গ্রহণ করিব?' এইরূপ আশঙ্কা করিয়া আমরা অনেক সময় ব্রত গ্রহণ করিতে ভয় পাই। এজন্য নিস্কুলানন্দ কহিয়াছেন—

'ত্যাগ ন টকে রে বৈরাগ বিনা।'

বৈরাগ্য বিনা ত্যাগ স্থায়ী হয় না। যাহার কোনো বিষয়ে

পূর্ণবৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানে তার পক্ষে ব্রত বা শপথগ্রহণ করা অনিবার্য্য বিধান।

ভালভাবে আলোচনা ও পাকাপাকি চিন্তার পর ১৯০৬, সালে আমি ব্রত গ্রহণ করিলাম। এ পর্য্যন্ত আমি স্ত্রীকে কিছুই জানাই নাই; কিন্তু ব্রত লইবার সময় তাহার সহিত আলোচনা করি। তিনি কোনো বাধা দিলেন না।

এই সময় ভারি মুস্কিলে পড়িয়াছিলাম। আমার শক্তি ছিল কম। কিরূপে আমি ইন্দ্রিয় দমন করিব? স্ত্রীর সহিত কাম সম্বন্ধ ত্যাগ করা আমার নিকট নূতন ঠেকিল। তথাপি আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, ইহাই আমার কর্ত্তব্য। আমার উদ্দেশ্য মহৎ—ভগবান শক্তি দিবেন ভাবিয়া আমি ইহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম।

বিশ বৎসর পরে সেই ব্রতের কথা স্মরণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ বিস্ময় ও পুলকে পূর্ণ হইতেছে। ১৯০১ সাল হইতে আমার সংযম পালনের ইচ্ছা প্রবল হয়, এবং তখন হইতে আমি ইহা অল্প বিস্তর পালন করিতে ছিলাম; কিন্তু ১৯০৬ সালে যে-স্বতন্ত্রতা-সুখ অনুভব করিলাম, তাহা পূর্ব্বে কখনও করি নাই। কারণ ইহার পূর্ব্বে আমি বাসনাবদ্ধ ছিলাম, যখন-তখন ইন্দ্রিয়ের অধীন হইতাম। এখন হইতে ব্রতই আমাকে প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা আমি বেশী বেশী বুঝিতে লাগিলাম। ফিনিক্সে থাকিতে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম। আহত-সেবার কাজ হইতে ছুটী পাইয়া ফিনিক্সে গিয়াছিলাম। সেখান হইতে আমাকে শীঘ্রই জোহান্নিসবার্গে যাইতে হইল। সেখানে যাওয়ার এক মাসের ভিতর সত্যগ্রহের বুনিয়াদ পত্তন হইল। কে জানে, ব্রহ্মচর্য্য আমাকে এই কাজের উপযোগী করিয়া গড়িতেছিল কিনা! সত্যগ্রহের কথা আমি

পূর্ব্বে কল্পনাও করি নাই। ইহা অনায়াসে অনিচ্ছায় আসিয়া পড়িল। কিন্তু আমি দেখিলাম ইহার পূর্ব্বেকার ঘটনায় আমাকে এই আদর্শের দিকে লইয়া আসিয়াছে। ফিনিক্সে যাওয়া, আমাকে আদর্শে পৌঁছিবার উপযোগী করিয়াছিল।

পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালনই ব্রহ্মদর্শন। এ জ্ঞান আমার শাস্ত্রপাঠে হয় নাই। এই জ্ঞান অভিজ্ঞতা হইতে ধীরে ধীরে লাভ হইয়াছে। ব্রত লওয়ার পর, দিন দিন আমার এই জ্ঞান হইয়াছে যে, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা শরীর মন ও আত্মা রক্ষা হয়। এখন হইতে ব্রহ্মচর্য্যকে কঠোর তপস্যার ন্যায় ঠেকিত না ইহা আনন্দ শান্তি ও তৃপ্তি দান করিত। এ জন্য আমি প্রত্যহ ব্রহ্মচর্য্যের নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতাম।

কিন্তু একথা যেন সকলে মনে রাখেন যে, যদিও আমি ইহা পালন করিয়া বেশী বেশী আনন্দ পাইতাম, তথাপি ইহা আমার পক্ষে সহজ ছিল না। ছাপ্পান্ন বৎসর পার হইয়া এখনও বুঝিতেছি ইহা কত শক্ত। আমি ক্রমশঃ বুঝিতেছি, এই ব্রত পালন করা তলোয়ারের ধারের উপর দিয়া চলার ন্যায় কঠিন। এ জন্য নিরন্তর সজাগ থাকিতে হয়।

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথম লোভ দমন করিতে হইবে। নিজে দেখিয়াছি, রসনেন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণ বশে আনিতে পারিলে, ব্রহ্মচর্য্য পালন করা অতিশয় সহজ হয়। এজন্য ঐ সময় হইতে কেবল নিরামিষাশীরূপে নহে, ব্রহ্মচারীর দৃষ্টিতেও আহার নির্ব্বাচন করিতে হইবে। খাদ্য পরিমিত, সাদাসিধে, মশলাহীন ও সম্ভব হইলে কাঁচা হওয়া চাই। আমি এসব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

ছয় বৎসর পরীক্ষার পর বুঝিয়াছি, টাটকা ফল ও বাদাম ব্রহ্মচারীর উপযুক্ত খোরাক। যখন আমি শুষ্ক অথবা পাকা ফল খাইয়া থাকিতাম,

তখন যেরূপ নির্বিকার থাকিতে পারিতাম, খোরাক বদলাইলে সেরূপ থাকিতে পারি নাই। ফলাহার করার সময় ব্রহ্মচর্য্য পালন করা সহজ ছিল, দুগ্ধপানের সময় আমাকে এজন্য বিশেষ বেগ পাইতে হইত। ফলাহার ছাড়িয়া আবার দুধ ধরিলাম কেন, তাহা উপযুক্তস্থানে আলোচিত হইবে। এখানে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ব্রহ্মচর্য্যের পক্ষে দুধ বিঘ্নস্বরূপ। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন, ব্রহ্মচারী মাত্রকেই দুধ ত্যাগ করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যের উপর বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের কিরূপ প্রভাব পড়ে, তাহা অনেক পরীক্ষার পর স্থির করা দরকার। দুধের মত পেশী নির্ম্মাতা ও এরূপ সহজপাচ্য কোনো ফলের সন্ধান আজ তক পাই নাই। কোনো ডাক্তার কবিরাজ হেকিমও ইহা বলিতে পারেন নাই। এ জন্য দুধকে উত্তেজক জানিয়াও, কাহাকেও ইহা ত্যাগ করিবার পরামর্শ দিতে পারি না।

খাদ্য নির্ব্বাচন ও ইহার পরিমাণ নির্দ্ধারণের ন্যায় উপবাসও ব্রহ্মচর্য্যের বাহ্যিক সহায়তাকারী। ইন্দ্রিয় এরূপ বলবান যে, তাহাদিগকে চারিদিক হইতে নিগ্রহ করিলেও, সূক্ষ্মাকারে ইহা থাকিয়া যায়। এ কথা সকলে জানেন যে, ইন্দ্রিয় সকল আহার্য্য বিনা শক্তিহীন হয়। এ জন্য সংযমের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত উপবাসে ইন্দ্রিয়দমনের সাহায্য করে। কতলোকে উপবাস করিয়াও কোনো ফল পায় না। তাহারা ভাবে তাহারা খুব উপবাস করিতে পারে। তাহারা বাহ্যিক উপবাস করে, কিন্তু মনে মনে ছাপান্ন প্রকার জিনিষ ভোগ করে; উপবাসের সময় তাহারা পরে কি খাইবে কি পান করিবে, তাহা লইয়া ব্যস্ত থাকে। এরূপ উপবাস দ্বারা লোভ অথবা কাম কিছুই দমন হয় না। মানুষের মন যখন ইন্দ্রিয়দমনের সহায়তা করে তখনই উপবাসে উপকার করে।

বিষয়ভোগের প্রতি বৈরাগ্য হওয়া চাই। মনই সমস্ত বিষয়বাসনার মূল। উপবাসে সীমাবদ্ধ ফল পাওয়া যায়, কিন্তু উপবাসকারী লোকও ইন্দ্রিয়ের দাস হইতে পারে। উপবাস ভিন্ন বিষয়বাসনার মূল নষ্ট করা আমার নিকট অসম্ভব ঠেকে। এজন্য ব্রহ্মচারীর পক্ষে উপবাস অপরিহার্য্য। অনেকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হয়, কারণ খানাপিনা প্রভৃতি বিষয়ে অব্রহ্মচারীর মতন থাকিয়াও তাহারা ব্রহ্মচর্য্য পালনের ইচ্ছা করে। গরমের দিনে শীতকালের ঠাণ্ডা অনুভব করার চেষ্টার ন্যায়, তাহাদের উদ্যম ব্যর্থ হয়। সংযমী ও স্বেচ্ছাচারী, যোগী ও ভোগীর জীবনের ভিতর স্পষ্ট পার্থক্য থাকিবে। তাহাদের মধ্যে যে মিল, তাহা কেবল বাহ্যিক। এই ভেদ সূর্য্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে হইবে। দুজনেই চোখ দিয়া দেখে; কিন্তু ব্রহ্মচারী ভগবানের মহিমা দর্শন করে, এবং ভোগী নাচ তামাসা দেখিতে মত্ত থাকে। উভয়েই কাণের ব্যবহার করে; কিন্তু একজন শোনে ঈশ্বর-ভজন আর একজন শোনে বিলাস-সঙ্গীত। দু জনেই অনেক সময় রাত্রি জাগরণ করে; কিন্তু একজনে এই সময় হৃদয় মন্দিরে অবস্থিত ভগবানের প্রার্থনা করে, আর এক জন রঙ্গরস নৃত্যগীতে মত্ত থাকিয়া ঘুমের কথা ভুলিয়া যায়। দু জনেই ভোজন করে; কিন্তু এক জন দেহ মন্দিরকে ঠিক রাখার জন্য আহার করে, আর এক জন জিহ্বার তৃপ্তির জন্য নানারকম জিনিষ দিয়া উদর পূর্ণ করে এবং শরীরকে দুর্গন্ধযুক্ত নর্দ্দামার মতন করিয়া ফেলে। দু জনের ভিতর আকাশ পাতাল প্রভেদ, ইহা বাড়িবে বই কমিবে না।

কায়মনোবাক্যে সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযমই ব্রহ্মচর্য্য। আমি প্রত্যহ ক্রমশঃ বুঝিতেছি, ইহার জন্য উপরোক্ত উপায়ে সংযমের বিশেষ প্রয়োজন আছে। ত্যাগের যেরূপ সীমা নাই, সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যেরও সীমা নাই।

এরূপ ব্রহ্মচর্য্য অল্পচেষ্টায় লাভ হয় না। কোটি কোটি লোকের পক্ষে ইহা তো আদর্শরূপেই থাকিয়া যাইবে। ব্রহ্মচারী সর্ব্বদা নিজের ত্রুটীর দিকে নজর রাখিবেন, আপনার অস্থি-মজ্জার ভিতর লুক্কায়িত বিকার ভাব ও ইন্দ্রিয় সকলকে চিনিয়া রাখিবেন, এবং সে সব দূর করার জন্য চেষ্টা করিবেন। যতদিন পর্য্যন্ত চিন্তা ইচ্ছাশক্তির বশে না আসিবে, ততদিন পর্য্যন্ত পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করা অসম্ভব। অনিচ্ছা প্রসূত চিন্তা মনের বিকার। মনকে বশে রাখিতে পারিলে, চিন্তাও বশীভূত হইবে। বায়ুকে বশ করা অপেক্ষা মনকে বশ করা কঠিন। কেহ যেন মনে না করেন, ইহা অসম্ভব। ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, এবং এই আদর্শে পৌঁছিবার জন্য যে বিপুল চেষ্টা করিতে হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

দেশে আসিয়া আমি বুঝিয়াছি, এইরূপ ব্রহ্মচর্য্য কেবল মানবীয় চেষ্টায় লাভ হয় না। এপর্য্যন্ত আমার এক ভুল ধারণা ছিল: আমি ধরিয়া লইয়াছিলাম ফলাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের মূল পর্য্যন্ত উচ্ছেদ করা যায় এবং অভিমান বশে ভাবিতাম, আমার আর কিছু করার দরকার নাই।

কিন্তু এসব কথা পরে আলোচিত হইবে। আমি স্পষ্ট বলিয়া রাখি, যাহারা ভগবদপ্রাপ্তির জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে ইচ্ছুক, তাহারা যেন হতাশ না হন। অবশ্য নিজেদের চেষ্টার উপর তাহাদের যতখানি বিশ্বাস আছে, ভগবানের উপর তাহাদের ততখানি বিশ্বাস থাকা চাই।

> বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ
> রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।

নিরাহারীর বিষয় তৃষ্ণা শান্ত থাকে, কিন্তু রস (বিষয় ভোগেচ্ছা) থাকিয়া যায়। রসও ঈশ্বরদর্শন দ্বারা শান্ত হয়। সে জন্য ভগবানের নাম ও ভগবানের করুণা মোক্ষকামীর শেষ অবলম্বন। হিন্দুস্থানে ফিরিয়া আসার পর আমি এই সত্যের সন্ধান পাই।

হিন্দী-নবজীবন ২০ ও ২৭ জানুয়ারী, ১৯২৭—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

জন্ম-নিরোধ

যথেষ্ট সঙ্কোচ এবং অনিচ্ছার সহিত আমি এই বিষয় আলোচনা করিতে যাইতেছি। ভারতে ফিরিয়া আসার পর হইতেই, কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আমি অনেক চিঠি পাইয়াছি। ব্যক্তিগত ভাবে এই বিষয় আলোচনা করি নাই। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে ছাত্রাবস্থায়, ইহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। একজন পবিত্রতাবাদী ও একজন ডাক্তারের মধ্যে তুমুল আন্দোলন হয়.পবিত্রতাবাদী প্রাকৃতিক উপায়ে সন্তান-নিরোধের পক্ষপাতী ছিলেন, ডাক্তার ছিলেন কৃত্রিম উপায়ের পক্ষপাতী। জীবনের সেই প্রথম অবস্থায়, কিছুদিন আমি কৃত্রিম উপায়ের পক্ষপাতী হইয়াছিলাম; কিন্তু শীঘ্রই ইহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াই। বর্ত্তমানে কতকগুলি হিন্দী-কাগজে এই বিষয় এমন আপত্তিজনক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাতে শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। কৃত্রিম উপায়ের পক্ষপাতী বলিয়া আমার নাম উল্লেখ করিতেও এক জন লেখক ইতস্ততঃ করেন নাই। এ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি অথবা লিখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আরও দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম ইহার সমর্থনকারীরূপে দেখিয়াছি। তাহাদিগকে না বলিয়া তাহাদের নাম প্রকাশ করিতে চাই না।

জন্ম-নিরোধের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দুই মত হইতে পারে না। কিন্তু প্রাচীন যুগ হইতে আত্ম-সংযম বা ব্রহ্মচর্য্যের সাহায্যে এ কার্য্য হইয়া আসিতেছে। ইহা অব্যর্থ মহৌষধ। যাহারা ইহা অভ্যাস

করেন, ইহা তাঁহাদের মঙ্গল করে। জন্ম-শাসনের কৃত্রিম উপায় আবিষ্কার না করিয়া, আত্মসংযমের উপায় বাহির করিতে পারিলে, চিকিৎসকগণ মানবজাতির কৃতজ্ঞতা লাভ করিবেন। সহবাসের উদ্দেশ্য সুখ নহে, ইহার উদ্দেশ্য বংশরক্ষা। সন্তান লাভের ইচ্ছা না থাকিলে যৌনমিলন অপরাধ।

কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের অর্থ পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া। ইহার ফলে স্ত্রীপুরুষ সকলে উচ্ছৃঙ্খল হয়। এই উপায়কে যেরূপ সম্মানজনক মনে করা হইতেছে তার ফলে, সমাজের ভয়ে লোকে যতখানি সংযত হইয়া চলে, তাহা দ্রুত নষ্ট হইয়া যাইবে। কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের ফলে দুর্ব্বলতা ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বাড়িবে; ব্যাধি অপেক্ষা ঔষধে বেশী ক্ষতি করিবে। কোনো কাজ করিয়া, তার ফল এড়াইতে যাওয়া অন্যায় ও নীতিবিরুদ্ধ। যে অতিরিক্ত খায়, পেটের বেদনা হইলে, এবং উপবাস করিলে তাহার মঙ্গল হয়। আকণ্ঠ ভোজন করিয়া, তার ফল হইতে মুক্ত হইবার জন্য টনিক অথবা অন্য ঔষধ খাইলে ক্ষতি হয়। বেপরোয়াভাবে ইন্দ্রিয়-সেবা করিয়া, তার ফল এড়াইতে চাওয়া আরও খারাপ। প্রকৃতি দেবী নির্দ্দয়, তাহার আইন ভঙ্গ করিলে তিনি পূর্ণ প্রতিহিংসা গ্রহণ করেন। নৈতিক বাধা দ্বারাই নৈতিক ফল পাওয়া যায়। অন্য উপায়ে ঠেকাইতে গেলে ঠেকানর আসল উদ্দেশ্য নষ্ট হয়। কৃত্রিম উপায় অবলম্বনকারীরা এই যুক্তি পেশ করেন যে, একটু হাল ছাড়িয়া দিয়া চলাই জীবনের পক্ষে দরকারী। ইহার অপেক্ষা কিছুই ভ্রমপূর্ণ হইতে পারে না। যাহারা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করিতে উৎসুক, প্রাচীনকালে লোকে কিরূপে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে ইহা করিতেন তাহারা তাহা স্থির করিয়া সেই পথ পুনঃপ্রচলনের চেষ্টা করুন। তাহাদের সম্মুখে অনেক প্রাথমিক

বাধাবিপত্তি আসিবে। বাল্য বিবাহের ফলেও লোক-সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িতেছে। বর্ত্তমান কালের জীবনযাপন-প্রণালীও, অবাধ বংশবৃদ্ধির জন্য অনেক খানি দায়ী। এই সব কারণ অনুসন্ধান করিয়া, প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিলে নীতি হিসাবে সমাজ উন্নত হইবে। অধৈর্য্য হইয়া লোকে যদি এসব অগ্রাহ্য করে এবং কৃত্রিম উপায় যদি প্রচলিত হইয়া উঠে, তবে ইহাতে নৈতিক অধঃপতন ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না।

যে সমাজ নানা কারণে দুর্ব্বল হইয়াছে, কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিলে, তাহা আরও শক্তিহীন হইবে। যাহারা চিন্তা না করিয়াই কৃত্রিম উপায় সমর্থন করেন, তাহারা যেন আবার এই বিষয় আলোচনা করেন, তাহাদের অনিষ্টকর প্রচার হইতে বিরত থাকেন, এবং বিবাহিত অবিবাহিত সকলের ভিতর ব্রহ্মচর্য্য প্রচার করেন। ইহাই জন্ম নিয়ন্ত্রণের শ্রেষ্ঠ ও সহজ উপায়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া—১২ মার্চ, ১৯২৫—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

শেষ কথা *

যাহারা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকে ধর্ম্ম কাজের ন্যায় বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করেন না এবং সংযম পালন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, নীচের কথাগুলি তাহাদের উপকারে লাগিতে পারে :

১। তুমি যদি বিবাহিত হও, তবে স্ত্রীকে ভোগের সামগ্রী মনে না করিয়া তাহাকে সঙ্গিনী, বন্ধু এবং সহকর্ম্মী মনে করিবে।

২। আত্ম-সংযম জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যখন নিজেদের কাজের ফল সম্যকরূপে জানিয়া উভয়ে যৌনমিলনের জন্য ইচ্ছা করিবে, মাত্র সেই অবস্থায় ইহা সমর্থন করা যায়।

৩। যদি তুমি অবিবাহিত হও, তবে সমাজ, তোমার ভাবী স্ত্রী ও তোমার নিজের মঙ্গলের জন্য তুমি আপনাকে পবিত্র রাখিবে। এই কর্ত্তব্যবোধ বাড়াইলে ইহা সমস্ত প্রলোভন হইতে তোমাকে নিশ্চিত রূপে রক্ষা করিবে।

৪। যে অদৃশ্য শক্তিকে আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু অন্তরে অনুভব করি, তিনি সব সময় আমাদিগকে চোখে চোখে রাখিতে-ছেন এবং আমাদের প্রত্যেক অপবিত্র চিন্তায় হিসাব রাখিতেছেন—এই কথা মনে থাকিলে সেই শক্তি তোমাকে সব সময় সাহায্য করিবে।

---

* মহাত্মা গান্ধী লিখিত Self-Restraint versus Self-Indulgence (সংযম বনাম উচ্ছৃঙ্খলতা) নামক পুস্তকের ভূমিকা হইতে গৃহীত।

৫। সংযমীর জীবন যাপন প্রণালী ভোগীর জীবন যাপন প্রণালী হইতে বিভিন্ন প্রকার হওয়া উচিত। এই জন্য, খাদ্য, বেড়াইবার স্থান পাঠ্যবিষয় ও সঙ্গী নির্ব্বাচনে খুব সাবধান হইবে।

সাধু ও পবিত্র চরিত্র লোকের সংসর্গে থাকিবে।

দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া ইন্দ্রিয় উত্তেজক উপন্যাস ও মাসিক পত্রাদি বর্জ্জন করিবে এবং যাহা মানবসমাজকে বিপদ হইতে রক্ষা করার উপায় নির্দ্দেশ করে, সেইরূপ পুস্তকাদি পড়িবে। এমন একখানা বই সব সময় কাছে রাখিবে, যাহা বন্ধুর ন্যায় তোমাকে বিপদে আপদে সাহায্য ও সৎপথে চালিত করে।

থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখিবে না। যাহাতে উৎসাহ ও কাজ করার শক্তি বৃদ্ধি করে তাহাই বিশ্রাম, যাহাতে অবসাদ আনে তাহা বিশ্রাম নহে। সার্ব্বজনিক উপাসনায় যোগ দিবে। সেখানকার কথা ও সুর আত্মাকে উন্নত করে।

রসনা তৃপ্তির জন্য খাইবে না, ক্ষুধা শান্তির জন্য খাইবে। অসংযত লোকে খাওয়ার জন্য বাঁচিয়া থাকে, সংযমী লোকে বাঁচিয়া থাকার জন্য খায়। সব রকম উত্তেজক মশলা মদ প্রভৃতি এবং ভালমন্দ বিচার শক্তি যাহাতে লোপ করে, সেইরূপ তামাক প্রভৃতি মাদক দ্রব্য বর্জ্জন করিবে। আহারের সময় ও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট রাখিবে।

৬। যখন ইন্দ্রিয় দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে, তখন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সাহায্যের জন্য ভগবানকে ডাকিবে। রামনাম আমার বিশেষ সহায়তা করে। এক টব জলে কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসিবে, পা বাহিরে রাখিবে। দেখিবে তৎক্ষণাৎ উত্তেজনা কমিবে। শরীর দুর্ব্বল না হইলে, কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত পা ডুবাইয়া রাখিবে; তবে ইহাতে ঠাণ্ডা লাগার ভয় আছে।

৭। শুইবার পূর্ব্বে এবং অতিভোরে খোলা হাওয়ায় দ্রুত পায়চারী করিবে।

৮। সকালে শুইলে ও সকালে বিছানা ত্যাগ করিলে স্বাস্থ্য ধন ও জ্ঞান লাভ করা যায়, এই প্রবাদটি সত্য। ৯ টায় শুইয়া ৪ টায় বিছানা ত্যাগ করা উত্তম। খালি পেটে ঘুমাইবে; এ জন্য সন্ধ্যা ৬টার পর কখনও খাইবে না।

৯। মনে রাখিও ভগবানের প্রতিনিধি রূপে সমস্ত জীবের সেবা করা এবং এইরূপে ভগবানের মহিমা ও প্রেমের কথা প্রচার করা মানুষের ধর্ম্ম। সেবাকেই আনন্দের একমাত্র উপায় বলিয়া জানিও; ইহা করিতে পারিলে, তোমার অন্য কোনো আমোদ-প্রমোদ দরকার হইবে না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪ মার্চ্চ, ১৯২৭—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

সমাপ্ত

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন বি-এ প্রণীত ও সঙ্কলিত

গ্রন্থাবলী

১। সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা

সচিত্র দ্বিতীয় সংস্করণ

পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত—মূল্য ৸০ বার আনা

মনোজ্ঞ গল্পে সুইস স্বাধীনতার কথা। উপন্যাস অপেক্ষাও মনোরম। পাঠে ছোট বড় সকলেই তৃপ্ত হইবেন।

প্রবাসী—ভাষা বেশ সরল। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে এই জাতীয় পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা—সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতার চিত্তাকর্ষক ইতিহাস জাতীয়-মুক্তি-কামনায় উদ্বুদ্ধ প্রত্যেক ভারতবাসীর পাঠ করা কর্ত্তব্য। স্কুলের বালক-বালিকাদের তরুণ চিত্তে দেশপ্রেমের চেতনা জাগাইতে ও উচ্চতর ভাবধারার সঞ্চার করিতে এই সরস, চিত্তাকর্ষক ও মহত্বপূর্ণ পুস্তকখানি যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

বাঙ্গলার কথা—ভাষা সহজ সরল, বর্ণনাভঙ্গীও বেশ। পাঠে লাঞ্ছিত উৎপীড়িত জাতির দুঃখে স্বভাবতঃই সহানুভূতি জাগিবে ও স্বাধীনতাস্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিবে। পুস্তকখানির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

প্রবর্ত্তক—বালক যুবক সকলেরই অনুপ্রেরণার বস্তু—জানা ও পড়া উচিত।

হিন্দু মিশন—এই পরাধীন জাতির মুক্তির কথা হইতে মুক্তি-প্রয়াসী ভারতবর্ষ অবশ্যই প্রভূত প্রেরণা লাভ করিবে। বইখানির বহুল-প্রচার কামনা করি।

সঞ্জীবনী—বিষয় মনোজ্ঞ, বিনয় বাবুর ভাষা চিত্তাকর্ষক। সুতরাং যে ইহা পাঠ করিবে সেই পরিতৃপ্ত হইবে।

মোহাম্মদী—সকলের পাঠ করা উচিত।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—তৃপ্তির সহিত পাঠ করিয়াছি। এরূপ স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক পুস্তক বাংলা ভাষায় যতই প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল।

Forward—It is an interesting narrative in Bengali in an easy style and should be read by our boys and girls.

২। বিপ্লবের আহুতি

টলষ্টয় অবলম্বনে—সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ১৲ এক টাকা

রুশ বিপ্লববাদীদের নির্য্যাতন কাহিনী ছবির মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। রুশ আমলাতন্ত্রের অন্ধ অবিচারে দেশহিতব্রত সর্ব্বত্যাগী যুবকগণের দেহপ্রাণ কিরূপে নিপীড়িত হইয়াছে, মানব মনের সহজ দয়া প্রেম ও পবিত্রতা কিরূপে ব্যর্থ করা হইয়াছে তাহা অপূর্ব্ব নিপুণতার সহিত প্রত্যক্ষ্যবৎ দেখান হইয়াছে। নির্জ্জন কারাগারের অন্ধকারের চাপে মানুষের মন কিভাবে ধীরে ধীরে অপ্রকৃতিস্থ হইয়া যায়, সরু ছড়ির পুনঃ পুনঃ আঘাতে কেমন করিয়া মানুষের প্রাণ "আইন সঙ্গত" উপায়ে বাহির করা হইত, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। নিষ্ঠুরতার এই ঘন দুর্য্যোগের মধ্যে পুরুষের বীর্য্য, জননীর স্নেহ এবং রমণীর প্রেম বিদ্যুতের মত ক্ষণে ক্ষণে উঁকি মারিয়া যাইতেছে।

প্রবাসী—'মনীষি টলষ্টয় লিখিত দুইটি গল্পের অনুবাদ এই পুস্তকে আছে। অনুবাদ ভাল হইয়াছে। আমাদের দেশাত্মবোধক গ্রন্থমালায় বইখানি বিশেষ স্থান অধিকার করিবে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

অমৃতবাজার পত্রিকা—অনুবাদ অতি সুন্দর হইয়াছে। মূল গ্রন্থের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে বজায় আছে।

মাতৃমন্দির—অনুবাদ বেশ প্রাঞ্জল। পুস্তকের ছাপা, কাগজ বাঁধাই চমৎকার।

Welfare—Story books in Bengali are but numerous; the one before us is a departure from them all in that it is the best translation of one of the greatest authors and seeks to make the great thought of a great thinker available to the Bengali world. We congratulate the author on his happy venture.

৩। হিন্দু-সংগঠন

সচিত্র—মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

সংখ্যায় বহু, ধন-সম্পদ-বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইয়াও হিন্দু কেন বর্ব্বর আরব, তুর্কী, পাঠান মোগল দস্যুদলের চরণে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়াছিল; কিরূপে নিরাশার ঘন অন্ধকারের ভিতর শিবাজী, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষ মৃতপ্রায় হিন্দু জাতিকে উদ্বুদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়াছিলেন; কিরূপে হিন্দুকে শুদ্ধি-সংগঠনের সাহায্যে আবার জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ইহাতে পাইবেন।

প্রবাসী—ইতিপূর্ব্বে গ্রন্থকার কয়েকখানি সুচিন্তিত গ্রন্থ লিখিয়া চিন্তাশীল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানিতে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিন্তাশীলতা, গবেষণা ও দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচীন কাল হইতে আজ অবধি হিন্দু জাতির গঠন ও সমাজ ব্যবস্থার সুন্দর পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রত্যেক হিন্দু যুবক এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া তাহার হিন্দুত্ববোধ উদ্বুদ্ধ করুন এবং হিন্দুর শক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করুন।

আনন্দবাজার পত্রিকা—এই গ্রন্থ পড়িয়া বর্ত্তমান যুগের হিন্দুরা যদি নিজেদের শোচনীয় দুর্গতি ও ভয়াবহ ভবিষ্যৎ বুঝিয়া আত্মরক্ষার্থ জাতিরক্ষার্থ প্রবুদ্ধ হয়, কার্য্যক্ষেত্রে যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করে, তবেই গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক হইবে।

বাঙ্গলার কথা—শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেন এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিয়া হিন্দু-সমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

হিন্দু—শিক্ষিত নরনারী মাত্রেরই এই পুস্তকখানি পাঠ করা কর্ত্তব্য—গ্রামে গ্রামে অশিক্ষিত সমাজের মধ্যেও শিক্ষিতদের ইহা পড়িয়া শোনান কর্ত্তব্য।

প্রবর্ত্তক—হিন্দু-জাগরণ সম্বন্ধীয় নানাপ্রয়োজনীয় তথ্যপূর্ণ এই মূল্যবান বইখানি সত্যই হৃদয়ের দরদ দিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন। হিন্দু-সংগঠন মূলক মহাপ্রশ্নটিকে ইতিহাস তথ্য ও ভাবুকতার বিচিত্র দিক দিয়া চিন্তা ও সমাধান চেষ্টার পরিচয় এই বইখানিতে পাইয়া আমরা সত্যই প্রীত ও উপকৃত হইয়াছি। বইখানি বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরে ঘরে স্থান পাউক।

৪। অস্পৃশ্যের মুক্তি

(মহাত্মা গান্ধী লিখিত)

মূল্য ৸৹ বার আনা

আত্মশক্তি—মহাত্মাজী "ইয়ং ইণ্ডিয়া" ও "হিন্দী নবজীবনে" অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা বাংলায় ভাষান্তরিত করিয়া বিনয়বাবু সাহিত্য ও সমাজের বিশেষ উপকার করিলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা—আশা করি পুস্তকখানি বাঙ্গলার ঘরে জাতীয় গীতার ন্যায় প্রচারিত হইবে।

প্রবাসী—এই কাজ করিয়া বিনয়বাবু বাংলা দেশের উপকার করিয়াছেন। আপামর বাঙ্গালী হিন্দু পুস্তকটী পাঠ করুন।

হিন্দুসঙ্ঘ—এই পুস্তক প্রকাশ করাতে দেশের ও জাতির খুবই মঙ্গল সাধিত হইবে।

প্রবর্ত্তক—'অস্পৃশ্যের মুক্তি' যুগদেবতার বাণী—তাঁহার বজ্রকঠিন আদেশ মন্ত্র। সকলেরই পড়া উচিত।

ফরওয়ার্ড—সব শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই পুস্তকের বহুল প্রচার হওয়া দরকার।

দৈনিক বসুমতী—আমাদের বিশ্বাস এই পুস্তক সর্ব্বত্র আদৃত হইবে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—পুস্তখানি বেশ সময়োপযোগী হইয়াছে। পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি হইলাম।

হিন্দু—বাংলার ঘরে ঘরে এই বইখানি প্রচারিত হইলে জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং সমাজ-জীবন সুদৃঢ় শক্তিসম্পন্ন হইবে। মহাত্মার এতগুলি লেখা একসঙ্গে বাংলায় উপহার দেওয়ার জন্য বিনয়বাবু অশেষ ধন্যবাদ ভাজন। বাংলার হিন্দুদের ঘরে ঘরে আমরা এই মূল্যবান গ্রন্থের প্রচার দেখিতে চাই।

বিধবা বিবাহ

(মহাত্মা গান্ধী লিখিত)

চতুর্থ সংস্করণ—মূল্য দশ পয়সা

মহাত্মা গান্ধীর লেখার অনুবাদ ভিন্ন বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ, সরকারী আইন প্রভৃতি অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় ইহাতে আছে।

প্রবাসী—করুণা ও ত্যাগের মূর্ত্তি মহাত্মা গান্ধী ভারতের অল্প বয়স্কা বিধবাদের জন্য দুঃখ বোধ করিয়া তাঁহাদের ক্লেশমুক্তির জন্য যে সব চিন্তা করিয়াছেন তাহা তাঁহার 'নবজীবন' ও 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে বহু প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকে সেই প্রবন্ধগুলির একত্রিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। বিধবাদের দুঃখ মোচনের জন্য যাহারা চিন্তা করিতেছেন এই সারবান যুক্তিপূর্ণ পুস্তক তাঁহাদের পাঠ করা কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালার কথা—মহাত্মা গান্ধীর প্রবন্ধগুলি বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া বিনয়বাবু বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের প্রকৃত হিত করিয়াছেন।

হিন্দু—প্রত্যেক হিন্দু নরনারীই এই ছোট বইখানি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

আত্মশক্তি—পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে জানিবার ও শিখিবার বিষয় অনেক আছে। পুস্তকের কলেবর দেখিয়া মূল্য কম মনে হইল।

হিন্দু সঙ্ঘ—মহাত্মা গান্ধীর প্রবন্ধগুলি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া বিনয়বাবু সমাজ ও সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে এই প্রকার পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

তরুণ সাহিত্য-মন্দির

১৯নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।